ভুলের মাশুল

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড়টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পরিচয়

মেসার্স গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্সের আগ্রহে এমন তৎপরতার সহিত এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল যে, মুদ্রণকালে বাহিরে থাকায় ইহার প্রুফগুলি দেখিবার সুযোগটুকুও ঘটিয়া উঠে নাই। সুযোগ্যের তত্ত্বাবধানে যদিও ইহা সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে; তথাপি, লেখকের পক্ষ হইতে অঙ্গরাগের অভাবজনিত ত্রুটি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মার্জ্জনা করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমার অন্যান্য রচনাগুলি এ পর্য্যন্ত যাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে, এই গ্রন্থের আখ্যানবস্তুনিচয়ের মধ্যেও তাঁহারা আনন্দের উপাদান পাইলে, লেখকের সাহিত্য সাধনা এবং প্রকাশকগণের প্রচুর অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

দেবনিবাস
কুণ্ডা পোঃ, দেওঘর
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুলের মাশুল

বধূ-বরণ

এক

গ্রামের মধ্যে কাত্যায়নী দেবীর সুনাম ও সুখ্যাতির অন্ত ছিল না। মহিলা-মজলিস তিনি রস-ভাষে মাতাইয়া দেন, পাড়া-প্রতিবেশীর আপদ-বিপদে বুক দিয়া পড়েন, ঝগড়া-কিচকিচি সুরু হইলে তিনি ছাড়া মিটিবার উপায় নাই—মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দুই পক্ষকে মিলাইয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। সকল বয়সের মেয়েরা 'কাতু দিদি' বলিতেই অজ্ঞান! পল্লীর বর্ষীয়ান্ পুরুষসমাজও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল; তাঁহাদের ভাষায় কাত্যায়নী দেবী আনন্দপুরের আনন্দময়ী।

কথাটা শুনিতে ভাল, শুনাইতেও আনন্দ। কিন্তু পাড়ার দশজনের বাড়ীতে নির্ব্বিচারে সুখ, শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করিয়া কাত্যায়নী দেবী যখন নিজের বাড়ীতে ফিরিতেন, তখন ঐ তিনটি কাম্য বস্তুর একান্ত অভাব দেখা যাইত সেইখানেই! কাযেই উহাদের অসদ্ভাব ঘটিলে, যে বহ্নি ধূমায়িত হইবার কথা, কোনও দিনই তাহার ব্যতিক্রম হইত না এবং আনন্দ শত চেষ্টা করিয়াও এ-হেন আনন্দময়ীর ক্ষুদ্র সংসারটির ত্রিসীমায় প্রবেশ করিবার পথ পাইত না।

ছেলে, বধূ ও তাহাদের কোলের শিশুটি লইয়াই কাত্যায়নীর সংসার। ছেলের নাম সুবোধ, পূর্ণ যুবা, মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে, এমন শান্ত প্রকৃতির সন্তান আজকাল খুব কমই দেখা যায়। কলিকাতার একটা সদাগরী আফিসে চাকুরী করে, পঁচিশ টাকা বেতনে কাযে ভর্ত্তি হইয়াছিল,

এখন বাড়িয়া ষাট টাকা হইয়াছে। সহর-তলীতেই বাড়ী, রেলে কলিকাতা ঘণ্টাখানেকের পথ। সুতরাং ট্রেণের মাসিক টিকিট কিনিয়া নিত্য যাতায়াত চলে। ঘরবাড়ী চলনসই, কতকটা পাকা, কতকটা কাঁচা। বাড়ীতে গোরু আছে, গয়লার জল খাইতে হয় না। ছোটখাটো একটু বাগানও জমা করা আছে, সেখান হইতে তরিতরকারীও কতকটা পাওয়া যায়। সুতরাং পাড়ার মধ্যে ইহারা যে একঘর ভাল গৃহস্থ এবং সাংসারিক অবস্থাও যে ইহাদের বেশ স্বচ্ছল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে সংসারে অভাব-অনাটনের আশঙ্কা থাকে না, মা-লক্ষ্মীর পদচ্ছায়া সেখানে অবশ্যই পড়িবার কথা। কিন্তু তবুও অকারণ কলহ-কিচকিচি এই স্বচ্ছল সংসারটির উপর একটা অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া কমলার শুভাগমনের পথে আগড় তুলিয়া দিয়াছে কেন, তাহাই গভীর সমস্যার বিষয়।

আনন্দময়ী কাত্যায়নীর পুণ্যের সংসারে এই নিরবচ্ছিন্ন অশান্তির সমাবেশ দেখিয়া অনেকেই বধূকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বসে, যদিও বধূ নির্ম্মলাকে এ পর্য্যন্ত তাহাদের কেহই প্রত্যক্ষভাবে দেখে নাই।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে নির্ম্মলা এই পরিবারে বধূরূপে প্রথম প্রবেশ করে। এখন তাহার বয়স বাইশের গণ্ডী পার হইয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত সমানভাবে সকল রকমে কায়মনপ্রাণে সে এই সংসারের সেবা করিয়া আসিয়াছে; একটি দিনের জন্যও সে বসিয়া ভাত খায় নাই বা তাহার পক্ষ হইতে কোনও প্রকার অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ভাব কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। নিতান্ত সাধারণ বংশের মেয়ে বলিয়াও নির্ম্মলাকে তাচ্ছীল্য করা চলে না, এদিক দিয়া তাহার পিতৃকুলের আভিজাত্যের মর্য্যাদা অনন্য-সাধারণ, তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে, বরং তাহার পতিকুলের দীনতাই

প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। রূপ সম্বন্ধেও নির্ম্মলা সুন্দরী-সমাজে অপাংক্তেয় নহে। অবশ্য, রঙই যদি রূপ-বিচারের মাপ-কাঠী হয়, তাহা হইলে হয় ত নির্ম্মলাকে রূপসী বলা যায় না,—কিন্তু স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দেহ, পরিপুষ্ট বাঁধুনি, সুশ্রী চেহারা এবং সকলের সেরা একজোড়া ডাগর চোখ ও পূরন্ত মুখের প্রতিভা-স্ফুরিত তেজোদৃপ্ত ভাবটুকু অবহেলা করিবার মত নহে।

নির্ম্মলা মোটামুটি ধরণের লেখাপড়াও শিখিয়াছে এবং আশৈশব এ দিকে তাহার একটা প্রবল আকর্ষণ থাকায়, সহজাত প্রতিভার প্রভাবে সে বাণীর অনেকখানি করুণা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন বই বোধ হয় অল্পই আছে—যাহা সে পড়িবার অবকাশ পায় নাই। এই বই পড়াটাই তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রলোভনের বিষয় এবং নেশার মতই এই দুর্ব্বার পাঠস্পৃহা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু যে তোতাপাখীর মত পড়িয়া যাইত, তাহা বলা চলে না, গভীর বিষয়গুলি লইয়া সে ভাবিত এবং সময় সময় নিজের অভিমতটুকুও সে লিখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে নারীর নিষ্ঠা ও পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়াসে হলাহল বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, নির্ম্মলা সেই সকল পুস্তকের স্থানবিশেষে ছাপার অক্ষরের পাশে বিদ্রূপভরা এমন তীক্ষ্ণ মন্তব্য সংক্ষেপে লিখিয়া দেয় যে, লাইব্রেরীতে তাহা লইয়া আন্দোলনের অন্ত থাকে না ; ফলে সেক্রেটারী তথাকথিত বইগুলি নিষিদ্ধ আলমারীর গর্ভে ঠাসিয়া দিয়া তালাবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। অথচ কেহ কোন দিন ঘুণাক্ষরেও জানিবার অবকাশ পায় নাই যে, তাহাদেরই গ্রামের সাধারণ একটি বধূ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই কীর্ত্তি করিয়া থাকে,—তাহারই হাতের কয়েক ছত্র লেখা তীক্ষ্ণ শতমুখীর মত ঐ অশ্লীল ছাগ-সাহিত্য শুদ্ধান্ত হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দেয়!

এই যে লেখাপড়া, ইহাও একান্ত গোপনেই নির্ম্মলাকে সারিতে হয়। কেন না, এ সম্বন্ধে তাহার বিড়ম্বনা-ভোগ নূতন নহে। পিত্রালয়েও এ জন্য তাহাকে খোঁটা সহিতে হইত। মা রাগ করিয়া যখন তখন শাসাইতেন,—'এ অভ্যেস ছেড়ে দে নিমি, এর জন্যে অনেক কথাই তোকে শুনতে হবে শ্বশুরবাড়ীতে। গৃহস্থঘরের মেয়েদের বই মুখে দিয়ে প'ড়ে থাকা সাজে না, দেখলেই মন বিষিয়ে ওঠে'—ইত্যাদি।

অবশ্য মা যাহা বলিতেন, অতিরিক্ত হইলেও, নির্ম্মলার পক্ষে তখন যে তাহা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিত, তাহা ঠিক বলা যায় না। এই অভ্যাসটির সাধনায় নির্ম্মলাকে তখন এতটা অভিভূতা দেখা যাইত যে, কোন দিকেই তাহার দৃক্‌পাত থাকিত না। মা ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। একের যাহা গুণ, অন্যের তাহা অপবাদ। পড়াশুনায় ছেলের যে গভীর অভিনিবেশ একান্ত প্রশংসার কথা, মেয়ে বলিয়া নির্ম্মলার তাহাতেই নিন্দা। কিন্তু মেয়েরই বা অপরাধ কি! মেয়েকে যে পরের ঘরে যাইতে হইবে,—সেখানে গিয়া যদি এমনই বই মুখে দিয়া পড়িয়া থাকে,—তখন? মা'র স্পষ্ট কথা স্পষ্টবাদিনী নির্ম্মলার চিত্ত স্পর্শ করিত, সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া লইত। কিন্তু কখনও তাহাকে তাহার মায়ের কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে শোনা যায় নাই বা অধিকার লইয়া কোনও অভিমান তাহার মনে বিদ্রোহ তুলে নাই।—ছেলে-মেয়ের সমানাধিকার-বাদের এই সমস্যা তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই বলিয়াই সে পরে লাইব্রেরীর দুর্নীতিমূলক বইগুলির অংশের উপর নিজের কলমের খোঁচা দিতে পারিয়াছিল!

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, পিত্রালয়ে যাহাই হউক, শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া অবধি সাংসারিক কাযকর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করিয়া নির্ম্মলা কোন দিনই পড়াশুনায় মগ্ন হয় নাই। বরং তাহার শাশুড়ী সময়ে অসময়ে পাড়া-

প্রতিবেশীদের আহ্বানে তাহাদের দায় উদ্ধার করিতে ছুটিলে, নির্ম্মলাকে একাই অধিকাংশ দিনই সংসারের যাবতীয় কায সম্পন্ন করিতে হইত। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট লইয়া সে এই সংসারে ঘর করিতে আসিয়াছিল যে, একটি দিনের জন্যও সে তাহার শাশুড়ীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। মনের সমস্ত উল্লাস, মুখের শেষ হাসিটুকুও পাড়ায় নিঃশেষ করিয়া দিয়া গভীর বিরক্তি ও অসীম অপ্রসন্নতা লইয়া শাশুড়ী যখন বাড়ীতে প্রবেশ করিতেন, বধূ তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিত, তাহার যত কিছু পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। একটি একটি করিয়া প্রতি কাযটির খুঁৎ বাহির করা ও তাহা লইয়া শ্লেষ-বিদ্রূপ-গঞ্জনার অন্ত থাকিত না। নির্ম্মলা যে দিন চুপ করিয়া যাইত, সে দিন ঝড় উঠিয়াই, দুই একটা ঝাপ্টা দিয়াই, ধীরে ধীরে থামিয়া যাইত। কিন্তু যে দিন সে জবাব দিত, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিত, সে দিনই ঘটিয়া যাইত বিপর্য্যয় কাণ্ড! শাশুড়ী জানিতেন, বধূর হৃদয়-দুর্গের কোন্ অংশটি কাঁচা, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তীক্ষ্ণ খোঁচা দিতেন। নির্ম্মলা সবই সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাপ-মায়ের নিন্দা সে কোন দিনই সহ্য করিতে পারিত না; তখন এই নিরীহ বধূটির মুখের কথাগুলি রাইফেলের গুলীর মত শাশুড়ীর বুকে গিয়া বিঁধিত।—সে দিন রান্নাঘরের দরজা আর খোলা হইত না, রাঁধা ভাত-তরকারী বদ্ধ ঘরে পড়িয়া পচিত।

সারাদিন আফিসে হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী ফিরিয়া সুবোধকেই এই দ্বন্দ্বের উপসংহার করিতে হইত। বেচারী তখন উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া যায়। মায়ের কথা শুনিয়া বলিত,—'জান ত মা, ও একবারে অবুঝ, কিছু যদি বোধশোধ আছে,—যা হোক, আজকের মত মাপ কর।'—আবার পরক্ষণে স্পষ্টবাদিনী পত্নীর স্পষ্ট কথার ধাক্কা খাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিত,—'বুড়ো হয়েছেন, ভীমরতি হয়েছেন,

কতদিন আর বাঁচবেন বল! ওঁর কথায় কি রাগ করতে আছে,—ওঠ, লক্ষ্মীটি!'

এমনই প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি বাধে এবং তাহার পর যথা-যথভাবে মান-অভিমানের ও মীমাংসার পালা চলিতে থাকে।

দুই

দিন যেমন নিত্য কাটে, আনন্দগ্রামের মেয়েদের বৈঠকও প্রত্যহই বসে এবং কাত্যায়নী দেবীই শেষ পর্য্যন্ত মজলিস জমাইয়া রাখেন। পাড়ার যেখানে যাহা ঘটে, তাহাই এখানে পল্লবিত হইয়া ফুটিয়া উঠে ও নানা মুখের নানা কথার রসে পূরন্ত হইয়া—তিলটি তালের মত ফাঁপিয়া বড় হইয়া উঠে।

পাড়ার যোগীন ঘোষালের অবস্থা এখন ভাল। ছেলেটি রেলের আফিসে চাকরী করে, একশো টাকা মাহিনা পায়। আরও উন্নতির আশা আছে। অদৃষ্টে তাহার উঁচুদরের শ্বশুরবাড়ীও জুটিয়া গিয়াছে। শ্বশুর আলীপুরের এক জন নামজাদা উকীল,—দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই দিকেরই দিক্‌পালবিশেষ। দেওয়া-থোওয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়,—এমন না নইলে নজর! বউটিও হইয়াছে মনের মত। গড়ন যদিও যুৎসই নয় এবং মুখখানিও কেমন যেন পাকা-পাকা, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কটা চামড়া সব দোষ কাটাইয়া দিয়াছে। শুধু কি গায়ের রং,—লেখায়-পড়ায়, গান-বাজনায়, কথাবার্ত্তায় যোগীনের বউ নিশার তুলনা কোথায়? কাত্যায়নী দেবীর মুখে এই বধূটির সুখ্যাতি আর ধরে না। এখন অধিকাংশ দিন এইখানেই মেয়েদেব সভা বসে।

সে দিন কাত্যায়নী দেবী একটু বিলম্বেই আসিয়াছিলেন সভা তখন

বসিয়া গিয়াছে এবং যোগীনের তরুণী বধূ নিশা সহরের সভ্যতা সম্বন্ধে নানা তথ্য শুনাইয়া শ্রোত্রীদিগকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কাত্যায়নীকে দেখিয়াই আলোচ্য প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সে হাসিয়া কহিল,—"পিসীমার আজ ভারী 'লেট্', এর জন্য 'ফাইন' দিতে হবে কিন্তু।"

কাত্যায়নী মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"তোর মুখ্যু পিসীমাকে নেকা-পড়া শিখিয়ে আগে নায়েক ক'রে নে!"

নিশা খপ করিয়া কহিয়া ফেলিল—"কেন, তোমার বউ ত খুব লেখা-পড়া জানে শুনেছি,—তারই টোলে কেন ভর্ত্তি হও না, পিসীমা!"

বউএর কথা উঠিতেই কাত্যায়নীর মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"আমার বউমার কথা আর ব'ল না, বাছা? তার লেখাপড়ার সম্পর্ক শুধু বাপের চিঠি লেখার বেলায়।"

নিশার শাশুড়ী উমাতারা দেবী এই সময় গলা ঝাড়িয়া কহিলেন,— "আমার বউমার কিন্তু অগাধ বিদ্যে, দিদি। বাপ কি কম পয়সা খরচ করেছেন ওঁর পেছনে! তিনটে পাসকরা মাষ্টার বরাবর পড়িয়ে এসেছে। আর দুটো বছর পড়লে বউমা আমার একটা পাস দিতেন।"

কাত্যায়নী তাঁহার বিবর্ণ মুখখানি যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন,—"তোমার দিদি বউ-ভাগ্য খুব ভাল।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিশা কহিল,—"আর তোমার বউই বা এমন কি নিন্দের, পিসীমা? নাই বা জানলে ভাল লেখাপড়া, তাতে হয়েছে কি? এই যে এত লেখাপড়া শিখে আমিই বা কি করছি? সেই দুটি বেলা হাঁড়ী-ঠেলা, খেটে খেটে হাড় কালি করা।"

কথাটা শাশুড়ী উমাতারার কানে বাজিল। মুখখানা মচকাইয়া তিনি প্রতিবাদ করিলেন,—"অমন কথা ক'য়ো না বউমা,—খেটে খেটে হাড় কালি করছ তুমি! কথাটা বলতে মুখে আটকালো না,

বাছা? একটা ঝি, একটা চাকর, দিন-রাত হিমসীম খাচ্ছে তোমার কন্না করতে।"

শাশুড়ীর কথায় বাধা দিয়া নিশা ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল,—"আমার কন্না করতে? আমার এক পাল ছেলে-মেয়ে আছে যে, কন্না কররার দরকার? তোমারই ত এক পাল পুস্যি নিয়ে সংসার,—ভাই, ভাগনে, বোন্‌পো, আসুন্তী-যাউন্তী—লেগেই আছে! তাদের করে না?"

বধূর ঝাঁঝ দেখিয়া উমাতারা গায়ের ঝাল গায়ে মারিয়া সুর নামাইয়া লইলেন, কহিলেন,—"করে না কি বলছি, করে। আর সংসার-ধর্ম্ম করতে গেলেই উপরি লোক আসেই! এতে ত রাগারাগির কথা কিছু হয় নি, বউ-মা। খেটে খুটে সংসার দেখবে বলেই বউ আনা। সব সংসারেই বউ-ঝি খাটে। এই কাতুদিদিকে জিজ্ঞাসা কর না, ওঁর বউ খাটে না?"

ভূতের মুখ দিয়ে হঠাৎ যেন রাম-নাম বাহির হইয়া পড়িল। নিজের উদ্দেশে উমাতারার প্রশ্নটির সাড়া পাইয়া কাত্যায়নীর মনটির ভিতরও বুঝি সাড়া পড়িয়া গেল; মুখখানি তুলিয়া তিনি কহিলেন,—"তা খাটে, দিদি! মিথ্যে কথা বললে অধর্ম্ম হবে, বউমা আমার সমস্ত সংসারটা যেন মাথায় ক'রে রেখেছে, আর গতরও তেমনি দিদি, কিছুতেই এ্যালে না। ঘরের পাট, রান্নাবাড়া, জল তোলা, বাটনা বাটা, এমন কি, গাই দোয়া পর্য্যন্ত—"

সবিস্ময়ে নিশা প্রশ্ন করিল,—"গাই দোয়ার কথা কি বলছ, পিসীমা? তোমার বউ গাই দোয় না কি?"

কাত্যায়নী বুঝিলেন, এ কথাটা ব্যক্ত করিয়া ভাল করেন নাই, কাযেই সামলাইয়া লইবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন,—"দোয়াল অবশ্য মাইনে করা আছে, আর, সেই বরাবর দুয়ে এসেছে; কিন্তু ইদানীং এমন

দেরী ক'রে আসা আরম্ভ করলে যে, চায়ের দুধ নিয়ে হৈ-হৈ প'ড়ে যেতো, ছেলেটিও ঠিক সময়ে দুধ খেতে পেত না,—তাইতে বউমা রাগ ক'রে নিজেই দুইতে লাগলো, দু এক দিন দুধ একটু কম হয়েছিল, কিন্তু এখন বরং বেশীই হয়, আর গোরুটাও বউমা-অন্ত প্রাণ!"

নিশা স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল, সহসা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—"এত করেও সে তোমার মন পায়নি, পিসীমা, ভারি আশ্চর্য্য ত!"

কাত্যায়নীর হারানো স্মৃতি ফিরিয়া আসিল,—মুখখানা যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"করলে কি হবে, বাছা! করে ত সব, কিন্তু মন খুলে ত করে না কিছু। মুখে বেশ বেজার বেজার ভাবও দেখতে পাই, মনের হ্যামাকটুকুও বুঝতে পারি; মুখ্যুসুখ্যু হলেও আমরা বুঝি সব, একেবারে যে ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, তা নয়।"

তিন

অকারণ বধূর সম্বন্ধে বিষোদ্গার করিয়া কাত্যায়নী যখন বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন সারা মনটিই তাঁহার বিষাইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, সভায় সব বিষটুকুই নিঃশেষে উদ্গার করা হয় নাই; তাই যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, পথটুকু আসিতে না আসিতেই তাহা তালগোল পাকাইয়া উঠি উঠি করিতেছিল। উঠিবার উপলক্ষ ঘটিয়া গেল।

রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি নির্ম্মলাই প্রতিদিন আহারের পর বাহির করিয়া দেয়, এবং তাহার শাশুড়ী যখন পাড়া বেড়াইতে বাহির হন, সেই অবকাশে সেগুলি নিজেই মাজিয়া ধুইয়া রান্নাঘরে তুলিয়া রাখে। সে দিন তাহার শরীরটা বেশ সুস্থ ছিল না, আহারের পরেই আলস্যে তাহার সারা দেহ যেন জড়াইয়া পড়ে। খোকাকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতে

তাহার শ্রান্তিবিজড়িত চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসে। তাহার পর পূরা তিনটি ঘণ্টা কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, সে সম্বন্ধে তাহার হুঁসই ছিল না। খোকাও মাকে হঠাৎ নিদ্রাতুর দেখিয়া আস্তে আস্তে তাহার পাশ হইতে উঠিয়া উঠানে আসিয়া তাহার মনের মত খেলা বাছিয়া লইয়াছিল—

কাত্যায়নী বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। এক পাল কাক আসিয়া সেই উচ্ছিষ্ট বাসনগুলির উপর পড়িয়াছে এবং ভুক্তাবশিষ্ট ভাত-তরকারি চঞ্চুপুটে তুলিয়া ছড়াছড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর খোকা নিবিষ্টমনে ডালের হাঁড়িতে ঢালা সকড়ি-জলে খানিকটা মাটী গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছে। কাত্যায়নীকে দেখিয়াই মহা উল্লাসে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিয়া উঠিল,—"তাকুলমা, এই ড্যাখ্—কেমন তন্দন মাকথি।"

চারিদিকে সকড়ির কাণ্ড দেখিয়া ঠাকুরমার মনের বিষ তখন মুখে উঠিয়াছে। চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"বাড়ীতে কি সব ম'রে আছে রে?"

কাকের কর্কশ কলরবে ও বাসন-কোসনের আওয়াজে যে গাঢ় নিদ্রা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, শাশুড়ীর মুখের এই মধুবর্ষণে তাহা মুহূর্ত্তমধ্যেই ছুটিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়াই নির্ম্মলা বাহিরে ছুটিয়া আসিল। কিছুই বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। তাহার নিজের ত্রুটি ভুলিয়া গিয়া ছেলের ত্রুটিতে বিচলিত হইয়া কহিল,—"হতচ্ছাড়া ছেলে একটু ফাঁক পেয়েই আমার হাড় জ্বালাতে বসেছে!"—ছেলের নড়া ধরিয়া সে জোরে টানিয়া তুলিল।

কাত্যায়নী মুখ খিচাইয়া কহিলেন,—"ছেলের কি দোষ,—ওর ওপর কিসের ঝাল ঝাড়ছ শুনি? বুড়ো ধাড়ী সকড়িপাট ফেলে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, এখন ছেলের ওপর রোক!"

নির্ম্মলা নিতান্ত অপরাধিনীর মতই কহিল,—"রোজ ত সকড়ি-পাট প'ড়ে থাকে না মা, আজ শরীরটা ভারী ম্যাজম্যাজ করছিল, একটু গা গড়াতে গিয়েই একবারে ঘুমিয়ে পড়েছি।"

কাত্যায়নীর মুখের বিষ তখনও সমস্তটুকু নামে নাই। তাই বধূর এ কথার উত্তরে তীব্রস্বরে কহিলেন,—"তা' ত পড়বেই,—নবাবের বেটী, ভাত মুখে দিয়েই নিদ্রাটুকু চাই-ই! পড়েছিলে আমার ঘরে তাই, আর কোথাও হ'লে—খেংরে দু'দিনে ঘুম ছুটিয়ে দিত।"

নির্ম্মলার বুকখানা তুলিয়া উঠিলেও মুখ হইতে একটি কথাও সে বাহির করিল না; চুপ করিয়া সে খোকার গায়ের কাদা ধুইতে লাগিল।

কিন্তু বধূকে নীরব দেখিয়াও কাত্যায়নী তাহাকে আজ রেহাই দিতে চান না। সাপ আত্মরক্ষার্থে গর্ত্তের ভিতর আশ্রয় লইলেও, কেহ কেহ তাহাকে খোঁচাইয়া বাহির করিতে ব্যগ্র হন। বধূকে আজ বাগে পাইয়া কাত্যায়নীও একতরফা খোঁচাইতে আরম্ভ করিলেন।

অনেক কথাই তিনি কহিলেন, পাড়ার আর পাঁচটি বধূর দৃষ্টান্ত তুলিয়া তাহাকে যতদূর খাটো করিবার, তাহা করিলেন, তবু নির্ম্মলার মুখে কথা নাই। কিন্তু অবশেষে এমন একটা বিষাক্ত বাণ ত্যাগ করিলেন— যাহার জ্বালা নির্ম্মলা আর বরদাস্ত করিতে পারিল না।

কাত্যায়নী কহিলেন,—"সবই আমার অদৃষ্টের ফল লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে যখন এ বাড়ীতে ঢুকেছে, তখনই বুঝেছি—মা-লক্ষ্মীকে কুলোর বাতাস দিয়ে দু'দিনে বিদেয় ক'রে দেবে।"

এইবার গর্ত্তের সাপ বাহির হইয়া পড়িল। ঘাড়টি তুলিয়া নির্ম্মলা তেজের সহিত কহিল,—"কোন্ ঘর থেকে আমাকে এনেছেন, বুকে হাত দিয়ে নিজের মনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করুন। যখন এ বাড়ীতে প্রথম পা দিই, তখন কি হাল এর ছিল, আর আজ কি

হাল হয়েছে—এ কথা আমি যেমন জানি, পাড়ার আর দশ জনেও জানে।”

বধূর মুখে জবাব পাইয়া কাত্যায়নী এবার ফুলিয়া উঠিলেন, তাহার দিকে ঝুঁকিয়া কহিলেন,—“কি,—কি,—বললি কি?”

নির্ম্মলা কহিল,—“বলবার ইচ্ছা ত মোটেই ছিল না, কিন্তু আপনি ত ছাড়বেন না! তাই যা সত্য, সেই কথাই বলেছি। আমি নিজে যাই হই না কেন, কিন্তু লক্ষ্মীমন্ত ঘর থেকে যে এ বাড়ীতে এসেছি, এ কথা আপনি না বললেও পাড়াপ্রতিবেশী সবাই বলবে।”

মুখখানি বিকৃত করিয়া কাত্যায়নী কহিলেন,—“আ-হা-হা, ম’রে যাই গো ম’রে যাই! লক্ষ্মীর গায়ের এঁটুলি হয়ে উনি আমার সংসার আলো করতে এসেছেন! তবু যদি আয়পয়ের জোর থাকত। মুখ নাড়তে লজ্জা করে না? আমি হেন শাশুড়ী তাই, আর কেউ হ’লে এমন হা-ঘরের মেয়েকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক’রে দিত।”

নির্ম্মলা এবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া সে আবেগকম্পিতস্বরে কহিল,—

—“বার বার আপনাকে বলেছি, মা, যোড়হাত ক’রে আবার বলছি, আপনি আমাকে যা বলবার বলুন, কিন্তু আমার বাবাকে টেনে কোনও কথা বলবেন না। আমি তা সইতে পারি নি কোন দিন, সইতে পারবও না।”

কাত্যায়নী মুখ ভেঙাইয়া কহিলেন,—“ও মা গো! তবেই ত ভয়ে সারা হয়ে গেলুম,—মাসোহারাটা বুঝি বন্ধ ক’রে দেবে? কেন, কি বলেছি? হয়েছে কি? কেন বলব না? হাজারবার বলবো—তুমি ছোট লোকের মেয়ে, লক্ষ্মীছাড়ার মেয়ে, হা-ঘরের মেয়ে—”

নির্ম্মলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া শাশুড়ীর কথা শুনিল, তাহার পর

নিজেকে সংযত করিয়া সে দৃঢ়স্বরে কহিল,—"আপনার মুখে ও কথা শোভা পায় না, মা,—কেন না, যাকে আপনি হা-ঘরে ব'লে গাল পাড়ছেন, তারই ঘরের টাকায় আপনার এই পাকা বাড়ী তৈরী হয়েছে!"

জোঁকের মুখে এবার নূণ পড়িল,—কাত্যায়নী দেবী কিছুক্ষণ থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর রোদনের সুরে কহিলেন,—"এই খোয়ারটুকুই আমার বাকি ছিল রে? দে দে—আমার ঘাড় ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দে,—না দিস্ ত তোর অতি বড় দিব্যি! আসুক সুবোধ, এর বিহিত আজ করবই; দিক্ আমাকে কাশী পাঠিয়ে। এ ত বাড়ী নয়—সেৎখানা, আমি যদি ওতে কোনও দিন আর মাথা গলাই, তা হ'লে—"

কথা আর শেষ হইল না,—পাকা ঘরের সংস্পর্শ ছাড়িয়া গোলপাতার ছাওয়া যে কয়খানি অতিরিক্ত ঘর ছিল, তাহারই একখানির ভিতর প্রবেশ করিয়া কাত্যায়নী দেবী সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

নির্ম্মলা যে কথাটা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। এ বাড়ীর মাটীর ঘর দুইখানি ফেলিয়া দিয়া দালান সমেত দুইখানা পাকা ঘর করিবার প্রস্তাব যখন উঠে, সুবোধ মায়ের কথায় ভিটে বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহে সচেষ্ট হয়; কিন্তু নির্ম্মলা তাহাতে আপত্তি তুলিয়া বসে। ভিটে-মাটী বাঁধা দিয়া ঋণ করিয়া ইমারৎ তৈরী করা যে গৌরবের কথা নহে, তাহা সে স্বামীকে বুঝাইয়া দেয়। কথাটা শেষে কাত্যায়নীর কানে গিয়া উঠে এবং এই কথা লইয়া অনেক খোঁটাই তাহাকে শুনিতে হয়। কাত্যায়নী বধূকে শুনাইয়া বলিয়াছিলেন,—"ধার করতে যখন বউমার এত আপত্তি, গায়ের গয়নাগুলো খুলে দিক না,—হাঁ, তা হ'লে বুঝি কত বড় বুকের পাটা!"

\`কিছুক্ষণ পরেই নির্ম্মলা তাহার গহনার বাক্সটি শাশুড়ীর সম্মুখে রাখিয়া বলিয়াছিল,—"এর জন্য আড়াল থেকে আমাকে কেন খোঁটা দিচ্ছিলেন মা, আমাকে হুকুম করলেই ত পারতেন।"

নির্ম্মলার পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া এই বাড়ী তোলা হয়।

চার

বাড়ী ফিরিয়া সুবোধের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এবারের কলহের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন, মিটমাটের কোনও সম্ভাবনাই নাই। মায়ের দুর্জ্জয় পণ—বধূর মুখদর্শন তিনি করিবেন না,—বধূ থাকিতে তিনি পাকা বাড়ীর ত্রিসীমায় পা দিবেন না; তাঁহার গোলপাতার ঘরই ভাল। বহু সাধ্য-সাধনাতেও মা যখন বদ্ধ দুয়ার খুলিলেন না, ভিতর হইতেই সরোদনে তাঁহার অভিমত জানাইয়া দিলেন, তখন সুবোধকে নির্ম্মলার শরণাপন্ন হইতে হইল। মিনতির সুরে কহিল,—"লক্ষ্মীটি! তুমি একবার যাও, তুমি মার কাছে মাপ চেয়ে বলো, তা হ'লে তিনি নিশ্চয়ই দোর খুলবেন।"

নির্ম্মলা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"যত কিছু জঞ্জাল ফেলতে ভাঙা কুলো আছি আমি! মাপ চাইব কি জন্য আমি শুনি? উনি মিছিমিছি যা নয় তাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন, মানুষের মন ত, কত বরদাস্ত হবে? কথার পিঠে কথা আমি বলেছি—উনিই আমাকে বলতে বাধ্য করেছেন। ঈশ্বর জানেন, এতে আমার দোষ কতখানি!"

সুবোধ সুর আরও কোমল করিয়া কহিল,—"সে কি আমিও জানি না, তুমি আমাকে ব'লে বোঝাবে? কিন্তু কি করি বল? মা দরজা বন্ধ ক'রে প'ড়ে থাকবেন, আর আমি কি ক'রে মুখে জল দেব, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব? আমারই কি শাস্তি কম? সেই কোন্ সকালে দুটো ভাত মুখে

দিয়ে গেছি, সারাদিন গাধার খাটুনি, তেতে পুড়ে বাড়ী এসে একটু শান্তি পাব,—না, আবার আগুনের ওপর পড়া! এ রকম ক'রে ক'দিন বাঁচব বল?"

নির্ম্মলার মনের সমস্ত গ্লানি স্বামীর কথায় মুছিয়া গেল, স্বামীর দুঃখ অনুভব করিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। তাহার উভয়সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া সমস্ত অভিমান ঠেলিয়া ফেলিয়া সে শাশুড়ীর উদ্দেশে চলিল।

কিন্তু কোনও ফল হইল না, বধূর কাতর মিনতির উত্তরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন,—"থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে আর টস্ দেখিয়ে কায নেই! গোরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না! আমি কে বল? বাড়ীর কেনা বাঁদী বই ত নয়! আমার খোয়ার করবে, সে আর বেশী কি কথা! বড় মানুষের বেটী তুমি—"

নির্ম্মলা আরও গভীরভাবে মিনতি করিতে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু শাশুড়ীর মুখে আবার তাহার পূজনীয় পিতার উদ্দেশে শ্লেষভাষের আভাস পাইয়াই ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীকে কহিল,—"তোমার মা, যা করবার হয়, তুমি কর; আমাকে এর মধ্যে ফেলে আর খুঁচিয়ে মেরো না। নিজের কানেই ত সব শুনলে!"

হতাশের সুরে সুবোধ কহিল,—"তা হ'লে কি করা যায় বল ত? আমি যে আর পারি না! কত লোকে পয়সার ভাবনায়—খাবার পরবার ভাবনায় পাগল, আর আমার ও-সব থেকেও, এ কি দুর্ভোগ বল দেখি?"

নির্ম্মলা কহিল,—"বুঝতেই ত পার্‌লে, তোমার মা আমার মুখদর্শন করবেন না,—আমি এখানে থাকলে উনি এ বাড়ীতে মাথা গলাবেন না; আর এই নিয়ে পাড়াময় চীৎকারের অবধি থাক্‌বে না।—তার চেয়ে তুমি এক কায কর, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। যদি কখনও তোমার মার মতিগতি ভাল হয়, তিনি নিজে আমাকে আন্‌তে চান, তা হলে

এলে,—না চান, আমি সেইখানেই প'ড়ে থাকবো, আমাকে পালন করবার ক্ষমতা এখনও তাঁদের আছে। তোমার ইচ্ছা হয়, মাঝে মাঝে দেখা দিও—”

সুবোধ মুখখানি ম্লান করিয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অবসন্ন দেহটির ভিতর তখন যেন একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আর্ত্তস্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

সহসা বাহিরে কাহার সাড়া পাওয়া গেল। অবিলম্বে দেখা গেল, ভৃত্যের সহিত যোগীন ঘোষালের মা উমাতারা বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। উমাতারা সুবোধকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই যে সুবোধ, তোমার মা কোথায়, বাবা?”

সুবোধের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি একখানি ছোট জল-চৌকি আনিয়া উঠানে পাতিয়া দিল। কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন হইল না,—উমাতারার সাড়া পাইয়াই কাত্যায়নী দুয়ার খুলিয়া দেখা দিলেন, বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—“দিদি যে। এমন সময় কি মনে ক'রে?”

কে বলিবে, এই মানুষটিই এতক্ষণ রাগে অভিমানে রুদ্ধ ঘরে বসিয়া বাড়ীময় একটা বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিলেন!

উমাতারা কহিলেন,—“দায়ে প'ড়ে তোমার দোরে ছুটে এসেছি দিদি —এই ভর সন্ধ্যেবেলায়। আমার বাড়ীতে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বেধে গিয়েছে। আমি না কি আমার বউমাকে ঠেস্ দিয়ে যা নয়, তাই বলেছি। যোগীন বাড়ীতে আসতে না আসতেই বউমা তাকে কি সব লাগিয়েছে। এই নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গেছে, দিদি। আমাকে ত এক চোট যা মুখে এলো তাই বল্লে, এখন বৌয়ের সঙ্গে ঝটাপটি লেগে গেছে। তাই তোমাকে ডাকতে এসেছি—শীগ্গীর চল, দিদি।”

কাত্যায়নী মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—"তাই না কি! কিন্তু তোমার বউ ত সে ধরণের মেয়ে নয়, দিদি! সে যে শাশুড়ী-অন্ত প্রাণ,—আর যোগীনও ত ছেলের মত ছেলে, সে তো মাগের ভেড়ো নয়! আচ্ছা চল, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

সকলে চলিয়া গেলেন। ছেলে ও বধূ দুই জনেই সব শুনিল ও বুঝিল। সুবোধ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নির্ম্মলার দিকে চাহিতেই দেখিল, সেও স্বামীর বিমর্ষ মুখখানির দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

পাঁচ

তাহার পর বৎসর ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কাত্যায়নীর রোষানল এখনও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। নির্ম্মলার কথা উঠিলেই তিনি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন।

নির্ম্মলা ছেলেকে লইয়া বাপের বাড়ীতেই আছে। নিজের হাতে পাতা সংসারটির দিকে তাহার সারা মন পড়িয়া থাকিলেও, নিরবচ্ছিন্ন অশান্তির আবেষ্টন হইতে অব্যাহতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। একটা বড় সংসার মাথায় করিয়া রাখিবার সামর্থ্য সে যেন সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছে, সুতরাং তাহার আদর সর্ব্বত্র। বাপের বাড়ীর সকলেই অবাক্ হইয়া আলোচনা করে—এমন গুণের বউ নিয়ে শাশুড়ীমাগী ঘর করতে পারলে না গা?

মা নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন,—"কপাল—কপাল!"

পাড়ার মেয়েরা সমবেদনা জানাইয়া বলেন,—

"অতি বড় সুন্দরী না পায় বর
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।"

আমাদের নিমির বরাতেও হয়েছে তাই। অত গতর, এমন আক্কেল বিবেচনা, সক্কলের মন যুগিয়ে কাজ বাজিয়ে চলা, এর ওপর গুরুজনের সেবা, ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তি, আজকালকার দিনে ক'টা মেয়ের আছে? কিন্তু হ'লে কি হবে,—সকল গুণে গুণবতী হয়েও বাছা স্বামীর ঘর করতে পেলে না! পোড়াকপাল আর কাকে বলে!"

নির্ম্মলা চুপ করিয়া সকলের কথা শুনিয়া যায়, কিন্তু তাহার তরফ হইতে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

নির্ম্মলার দিন কাজের ভিতর দিয়া কাটিয়া যায়, কাত্যায়নীও পাড়া বেড়াইয়া তাঁহার দিন কাটান, কিন্তু সুবোধের দিন কাটানই কঠিন হইয়া উঠে। আফিসে যতক্ষণ থাকে, কোনরূপে চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পর তাহার সারা মনটি নির্ম্মলার স্মৃতিতে ভরিয়া উঠে, মনে মনে ভাবে, সর্ব্বসুখী হইয়াও তাহার মত দুঃখী আজ কে?

সে দিন আফিসে আসিয়া সুবোধ নির্ম্মলার একখানা পত্র পাইল। নির্ম্মলা সংক্ষেপে লিখিয়াছে,—"খোকার জ্বর হয়েছে, তোমাকে দেখ্‌তে চায়; যদি ইচ্ছা হয় এবং তোমার মা অনুমতি দেন, একবার এসো; খোকা তোমার জন্যে বড় হেদিয়েছে।"

তরুণ বয়সের একমাত্র সন্তান, কত আদরের ধন সে! আজ তাহার অসুখ। সুবোধের মন বেদনায় অধীর হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল,—এত দিন তাহারা গিয়াছে, তাহাদের দেখিতে যাইবার প্রবল ইচ্ছা সে প্রাণপণে প্রশমিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, আজ সে ইচ্ছা দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল,—যা হইবার হইবে, আফিসের পান্টা আজ সে যাইবেই।

ছেলের জন্য গোটাকয়েক বেদানা ও কয়েকটা খেলনা কিনিয়া যখন সে বাসে উঠিল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের

ভিতরেও নানাবিধ ভাবনার গতি দ্রুততর হইতে লাগিল। তাই ত! কাযটা কি ভাল হ'ল? মা কি মনে করবেন? আজই এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবার কি দরকার ছিল? তাঁকে ব'লে এলে ত সব দিক বজায় থাকত!—আস্‌তে মানা করতেন? না না, তা কথনই করতেন না,—খোকার অসুখ, সে হেদিয়েছে, এ কথা শুনলে মা কখনই আমাকে রুখতেন না।

এমনই নানাবিধ চিন্তা একটির পর একটি উঠিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিতেছিল। হঠাৎ আরোহীদের একটা কথা তাহার কানে গেল। এক জন প্রশ্ন করিতেছিলেন,—"ছানা কিনেছেন দেখ্‌ছি, কত ক'রে নিলেন?" উত্তর হইল, "বলেন কেন মশাই, বারো আনার এক পয়সা কমে দিলে না; নাচার হয়েই নিতে হ'ল,—আজ দশমী কি না, বাড়ীতে বিধবা মা আছেন—"

শেষের কথা কয়টা কানে বাজিতেই সুবোধের মনে হইল, আরোহীদের লইয়া বাসখানি বুঝি আকাশের দিকে চলিয়াছে। হঠাৎ সে উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিল,—"বাঁধো, বাঁধো—সবুর!"

গাড়ী-শুদ্ধ লোক নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইল গাড়ী থামিতে না থামিতে সুবোধ রাস্তার উপর লাফাইয়া পড়িল।

আজ দশমী,—বাড়ীতে বিধবা মা!—এই চিন্তাতেই সে তখন অভিভূত! কি সর্ব্বনাশ,—মায়ের আজ দশমী, আর সে চলিয়াছে শ্বশুরবাড়ী? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে জাগিয়া উঠিল, নির্ম্মলা নিজেই এই দিনটিতে মায়ের রাত্রির জলযোগের কত আয়োজনই করিত! এখন তাহাকেই মায়ের দশমীর ব্যবস্থা করিতে হয়। নির্ম্মলা নাই, সেও যদি আজ বাড়ীতে না যায়, মায়ের অবস্থা কি হইবে? যাইবার সময় নির্ম্মলাই না এই ভারটুকু বিশেষ করিয়া তাহার উপরে দিয়া গিয়াছে

সুবোধ যখন বাড়ীতে ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। কাত্যায়নী ঘর-বার করিতেছিলেন। পুত্রের সাড়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—"এত রাত হ'ল কেন, বাবা! আমি ভেবে মরি! সেখানকার খবর সব ভাল ত?"

সুবোধ একটা ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল,—"খোকার জ্বর হয়েছে মা!"

"জ্বর হয়েছে? তাই বুঝি দেখতে গিয়েছিলে? আছে কেমন?"

"যাব ব'লে বেরিয়েছিলুম, মা! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অর্দ্ধেক পথে গিয়ে মনে পড়ল, আজ তোমার দশমী। তাই ফিরে এলুম।"

"কেন বাবা, ফিরে আসবার কি দরকার ছিল? একটা দশমীতে ফল-মিষ্টি না খেলে রাত কি কাটত না?"

"না মা, দশমীর রাতটিতে তোমাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবনা। সে বরাবর নিজের পয়সায় তোমার দশমীর জলখাবার যোগাড় করত। যাবার দিনটিতেও আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে যায়, আমি যেন নিজের হাতে তোমাকে—"

অশ্রুর আবেগে সুবোধের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া অবশেষে রুদ্ধ হইয়া গেল। কাত্যায়নীর বুকখানিও সেই সঙ্গে সবেগে দুলিয়া উঠিল। ভাবগদ্‌গদস্বরে এতদিন পরে তিনি কহিলেন,—"আর যাই হোক, বউমার যত্নআত্তির কথা একটি দিনও ভুলতে পারিনা। অনেক গুণই ত ছিল তার, শুধু মুখের দোষেই সব বিষিয়ে গেল রে! নইলে অমন গুণের বউমা আমার!—তাও বলি, আবাগের বেটী একবারে সব ভুলে গেল! হাঁ বাবা, খোকার কি অসুখ?"

সুবোধ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা আজ যেন তাঁহার মুখখানির উপর ভর দিয়া বসিয়াছে। সে কহিল,—"লিখেছে ত জ্বর হয়েছে, আর ভারী হেদিয়েছে।"

কাত্যায়নী ব্যথার স্বরে কহিলেন,—“আহা! হেদোবেনা? হেদিয়েই জ্বর ক'রে বসেছে। কালই তাকে দেখতে যেও, তাড়াতাড়ি ফিরে যেন কষ্ট পেয়োনা, সেখান থেকেই না হয় আফিস কোরো।”

সে রাত্রিতে সুবোধ বড় শান্তিতেই ঘুমাইল, শান্তির এমন মধুর বাতাস বহুদিন তাহার সন্তপ্ত দেহটির উপর দিয়া বহিয়া যায় নাই। সাংসারিক নিত্যকার অশান্তির বহ্নিতে দেহ-মন যাহাদের জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়, তাহারাই এই শান্তির সুখটুকু অনুভব করিতে পারিবে।

ছয়

সুবোধ যে দিন খোকাকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিল, কাত্যায়নী দেবী শুধু যে খোকার খবরই লইলেন, তাহা নহে,—নির্ম্মলার কথা, তাহার বাপ-মার কথা, ভাই-ভগিনীদের কথা—একটি একটি করিয়া খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া বেশ শান্ত-কণ্ঠেই কহিলেন,—“আহা, বেঁচে থাক তোমার শ্বশুরের অজ্বালা সংসার, বাড়বাড়ন্ত হোক্।”—অথচ এই কাত্যায়নী দেবীই নির্ম্মলার সাক্ষাতে কথায় কথায় তাহার পিতৃকুলের খোয়ার করিতে দ্বিধা করিতেন না। দাঁত সরিয়া পড়িলেই তখন তাহার কদর বুঝা যায়, তাহার পূর্ব্বে নহে।

নির্ম্মলা চলিয়া গেলে কাত্যায়নী দেবী যে একান্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায়না; বরং ইহার পর হইতেই তাঁহার বিরক্তিভাব আরও গাঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিত এবং বার্দ্ধক্য যেন দিন দিন তাঁহাকে আয়ত্তাধীন করিয়া তুলিতেছিল। পাড়াপ্রতিবাসীরাও তাহাদের আনন্দময়ী কাতুদিদির মুখে ও প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আভাস পাইতনা।

উমাতারার বাড়ীর বৈঠক ভাঙিয়া গিয়াছে, কাত্যায়নী সেখানে এখন আর বড় একটা যান না। তাঁহার বাড়ীর নিত্য কিচ্‌কিচি ও তজ্জনিত বিষম অশান্তি এখন এ বাড়ীর বৃহৎ সংসারটি উপর জমিয়া বসিয়াছে। বড়লোকের মেয়ে নিশার মুখের সম্মুখে কেহই এখন দাঁড়াইতে পারেনা। উমাতারার সহিত তাহার নিত্য কলহ বাধে এবং এমনভাবে মুখ ভেঙাইয়া সে শাশুড়ীর মুখের উপর যা তা বলিয়া জবাব দেয়, যাহা কোনও শাশুড়ীর পক্ষেই সহ্য করা সম্ভবপর নহে। উমাতারা বউয়ের সহিত কথায় পারিয়া উঠেন না; কথায় কথায় সে উকীল বাপের দোহাই দেয় এবং সে যে রীতিমত লেখাপড়া জানে, তাহার পরিচয় দেয়—ঝগড়ার সময় বাঙ্গালা কথার মাঝে এক একটা ইংরাজী বুক্‌নি যোগ করিয়া! উমাতারা তখন হার মানিয়া তাঁহার শেষ সম্বল ফোঁপাইয়া রোদনের আশ্রয় লন। কাত্যায়নী দেবীও এখানে আর পাত্তা পাননা,—তিনি উপরপড়া হইয়া ঝগড়া মিটাইতে আসিলে, নিশা এখন স্পষ্টই বলে,—"আমি তোমার সেই মেনীমুখো বউ নই, কাতুপিসী যে মুখটি বুজিয়ে সব সহ্য করব। আমি কারুর কথার কোনো তোয়াক্কা রাখিনা। সে মেয়ে আমি নই যে—সবাই মিলে আমার 'ক্যারিকেচার' কর্‌বে, আর আমি তাই শুনে লজ্জায় ঘোম্‌টা আরও বড় ক'রে টেনে দেব! আমি 'ডুয়েল্‌' লড়ব তার সঙ্গে, সে যেই হোক! আমার মুখ আছে, হাত আছে, ও-সব নাকে কান্নাকে আমি 'হেট্‌' করি।"

কাত্যায়নী নিজের বধূর কথাও শুনিয়াছেন, এই বধূটির কথাও শোনেন। এক একবার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করেন,—আমার বউমা যদি এই ধরণের কথা বলত আমাকে?

প্রশ্নটা যেন ক্রমশঃই তাঁহার মনটির ভিতর তালগোল পাকাইতে থাকে। পাড়ার কেহ জানিতনা, সুবোধও সন্ধান রাখিতনা,—প্রায়

প্রতি রাত্রিতেই কাত্যায়নী দেবীর শয্যাকণ্টকী অবস্থা হয়, শয্যার আশ্রয় লইলেই ছট্‌ফট করেন। বহু সাধ্যসাধনাতেও নিদ্রা ফিরিয়া তাকায় না,—চক্ষুর উপর উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে দুই বাড়ীর দুইটি বধূর মুখ,—মনের ভিতর তোলপাড় করে দু'জনেরই ব্যবহার! তাহার পর ধড়মড় করিয়া শয্যা ছাড়িয়া বাহিরের বাঁধানো রকটির উপর গিয়া বসেন, আপন মনে আর্ত্তস্বরে বলেন,—মিনি-দোষে সোণার কমলকে আমি জলে ভাসিয়ে দিয়েছি,—তার সাজানো সংসার আমি নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছি! আমার মতন এমন মহাপাতকী আর ভূভারতে আছে কি রে?

প্রায়ই দেখা যায়, যে-বাড়ীতে নিত্যই অবাধে কলহের কল্লোল উঠে, সেই সূত্রে সেখানে কথার পিঠে এমন ক্ষণে এক একটা কথা বাহির হইয়া যায়, যাহা অবশেষে সাংঘাতিক হইয়া পড়ে।

কি একটা ব্রত উপলক্ষে পাড়ার মেয়েরা উমাতারার বাড়ীতে সমবেত হইয়াছিল। কায-কর্ম্ম চুকিয়া গেলে, কথাপ্রসঙ্গে রোজগারের কথা উঠিল। পাড়ার মধ্যে কাহার কত রোজগার, কোন্ কোন্ হতভাগ্য বেকার, উপরি পাওনা কাহার কত বেশী, এই সব আলোচনা হইতে শেষে যোগীনের পালা আসিল।

এক জন কহিলেন,—"এই বয়সে যোগীন আমাদের যা রোজগার করে, তা ফ্যাল্‌না নয়।"

ছেলের কথা পড়িতেই উমাতারা মুখখানা ঘুরাইয়া কহিলেন,—"অনেকে মানতেই চায়না যে, যোগীন আমার এত টাকা মাইনে পায়। আর পরের কথাই বা বলি কি বাপু, বৌমার বাবাই কি প্রথমে প্রত্যয় করেছিল? মিন্‌ষে আফিসে গিয়ে খোঁজ পর্য্যন্ত নিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার পর একবারে ধন্না দিয়ে পড়ল। এমন পাত্তর মেলে ক'টা, তোমরাই বলনা।"

নিশা তখন ঘরের ভিতর ছিল। কথাটা তাহাকে খোঁচা দিল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বেশ একটু তেজের সহিত কহিল,—"হাঁ, একশো টাকা পাইনে পায়, তাইতেই বাবার আর বিস্ময়ের সীমা ছিলনা, একেবারে হাঁটুগেড়ে ধন্না দিয়ে পড়েছিলেন তিনি—পাছে ফস্কে যায়! যার মটরের ড্রাইভার মাসে একশো টাকার ওপর পেটে, দুটো মুহুরী যার ফি মাসে দু'শো-আড়াইশো উপায় করে, একশো টাকার কেরাণীকে দেখে সে বর্তে যাবেনা?"

উমাতারার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; তিনিও সমান তেজে উত্তর দিলেন,—"কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে, তুমি ছুটে এসে তাতে ফোড়ন দিলে কেন বল ত? আর দেখ বাছা,—বাপের ধন-দৌলত যতই থাক্, তাতে মেয়ের বড়াই করবার কিছু নেই, ভায়েরা তার ভাগ দিতে আসবেনা। স্বামীর পয়সাই পয়সা, তাইতেই পরিবারের গরব কিন্তু তোমাকে কে বোঝাবে বল বাছা!"

নিশা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"বোঝাবার জন্যে আমি ত তোমাকে মাথার দিব্যি দিইনি,—তুমি আমার বাবার কথা তুলে ঠোক্কর দিলে কেন বল ত?"

উমাতারা বধূর কথায় আজ একবারে যেন মারমুখী হইয়া উঠিলেন, গলার স্বর তাঁহার যতদূর উঠিতে পারে, তাহার শেষ সীমায় তুলিয়া কহিলেন,—"বেশ করেছি, খুব করেছি, আমার খুসী। আমি তোর বাবার আটচালায় মাথা দিয়ে থাকিনা কি যে, কথায় কথায় বাবার নাম তুলে আমাকে শাসাবি?"

নিশা স্তব্ধ হইয়া শাশুড়ীর ঝঙ্কার শুনিল, এমন রূঢ় কথা আর কোন দিন সে শুনে নাই। শাশুড়ী যে তাহার মত বধূর মুখের উপর এমন কথা শুনাইবে, তাহা যেন তাহার স্বপ্নের অতীত। শাশুড়ীর এমন মূর্ত্তিও সে

কোন দিন দেখে নাই এবং তাহার গলার তেজ যে এত তীব্র, সে পরিচয়ও আজ সে প্রথম পাইল। কিন্তু নিশা চীৎকার করিলনা, শুধু সমবেত মহিলাদের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনারা সাক্ষী রইলেন, আমার শাশুড়ী আমার লাঞ্ছনা করেছেন, আমার বাবার মানহানি করেছেন।"

নিশার কথা শুনিয়া সকলেই মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। সাবিত্রীরাণীর মামলার নিষ্পত্তি সবেমাত্র হইয়াছে, সেই মামলায় সাবিত্রীর লাঞ্ছনাকারিণী শাশুড়ীর শাস্তির কথা অনেক শাশুড়ীকেই ভয়চকিত করিয়া তুলিয়াছে। খুব নামজাদা উকীলের মেয়ে নিশা, তাহার বাপ না কি রাতকে দিন করে, মুখের জোরে নির্দ্দোষীকে ফাঁসীতে লট্‌কায়, খুনীকে খালাস দেয়। এমন বাপের মেয়ে, সত্যই যদি কিছু করিয়া বসে?

কাত্যায়নীদেবীও আজ এ বাড়ীতে আসিয়াছিসেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি কথা কহেন নাই। নিশার কথা কয়টি শুনিয়া তিনিই প্রথমে কহিলেন,—"দিদি, থেমে যাও; বউ তোমার উকীলের বেটী,—শেষে কি কেলেঙ্কারী বাড়াবে?"

উমাতারার ঝাঁঝ তখনও কমে নাই,—তিনি কহিলেন,—"উকীল আছে তার ঘর আছে—আমার কি কর্‌বে শুনি?"

নিশার দুই চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল; সেই জ্বলন্ত চোখ দু'টি শাশুড়ীর মুখের উপর তুলিয়া সে কহিল,—"কি কর্‌বে—ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তা শুনবে। আমি ত্রিসত্যি করছি,—এ অপমানের শাস্তি আমি দেব—দেব—দেব। সাবিত্রীরাণীর শাশুড়ীর মতন তোমাকেও যদি আমি পুলিস-কোর্টে টেনে নিয়ে না যাই—আমি রামতারণ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে নই!"

কথাগুলি উদ্গার করিয়াই নিশা সবেগে নিজের ঘরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সাত

ঐ অপ্রীতিকর ঘটনাটির যবনিকা ঐখানেই পড়ে নাই। তাহা আরও অনেকদূর গড়াইয়াছে। নিশার আচরণে যোগীনও ক্রমশঃই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। এদিনের ঘটনা তাহাকেও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। মায়ের সম্মুখেই সে মুখরা পত্নীকে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দেয়, শ্বশুর বেচারীও রেহাই পান নাই। এক শ্রেণীর ছেলে আছে, তাহারা স্ত্রীর উপর চটিলে, তাহার রেস্‌টুকু স্ত্রীর পিতার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে না। যোগীনও ছিল এই ধরণের বিবেচক ছেলে! নিশা তাহার পিতাকে উপলক্ষ করিয়া এ পক্ষকে দাবাইবার যতখানি মৌখিক-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, যোগীন শ্বশুরের উদ্দেশে নানা অ-কথা কু-কথা কহিয়া তাহার পাল্টা জবাব দেয়। পরদিন যোগীন আফিসে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই নিশাও একখানা গাড়ী ডাকাইযা বাপের বাড়ী চলিয়া যায়। উমাতারা ঘাট স্বীকার করিয়া বধূর হাত দুইটী ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু নিশা তাহাতে দৃকৃপাতও করে নাই।

কাত্যায়নী সবই শুনিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর তখন হাহাকার করিতেছিল। মনে পড়িয়া গেল, নির্ম্মলার উপর রাগ করিয়া তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাপের বাড়ী যাইবার সময় সে একটিবার দরজাটি খুলিবার জন্য কি কাতর প্রার্থনাই জানাইয়াছিল! কিন্তু তাঁহার পাষাণ হৃদয় গলে নাই,—অশ্রুমুখী বধূর প্রণামটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। সে ছিল তাঁহার বধূ!—আর, উমাতারার কাতর মিনতি উপেক্ষা করিয়া তাহার বধূর সদর্পে প্রস্থান!—দুই হাতে বুকখানি চাপিয়া ধরিয়া

কাত্যায়নী কহিলেন,—"আমার বউমার মত বউ আর কি কেউ পাবেরে!"

হঠাৎ কি একটা কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল,—এ কথা কোনদিন তিনি ভাবেন নাই, কল্পনাও করেন নাই। অন্ধকারে একটা উজ্জ্বল আলো যেন সহসা ফুটিয়া উঠিল।

সব কাজ ফেলিয়া কাত্যায়নী দেবী পাড়ায় ছুটিলেন। তাঁহার ভক্তের অভাব ছিল না! একটি ছেলেকে ডাকিয়া চুপিচুপি কি বলিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সুবোধ আফিসে গিয়াছে, এইবার নিজের আহারের ব্যবস্থা করিবার কথা। কিন্তু সে সব পড়িয়া রহিল। তাড়াতাড়ি একখানা কাচানো সাদা কাপড় পরিয়া একখানা রেশমী চাদর গায়ে দিলেন।

ছেলেটি আসিয়া খবর দিল,—গাড়ী আসিয়াছে। ঘরে ঘরে তালা দিয়া, সদর-দরজায় একটা প্রকাণ্ড কুলুপ লাগাইয়া, কাত্যায়নী দেবী গাড়ীর ভিতর গিয়া বসিলেন।

* * * * *

নির্ম্মলাদের বাড়ীতে সবেমাত্র গৃহদেবতার ভোগ হইয়াছে এবং মধ্যাহ্নভোজনের আসন পড়িয়াছে, এমন সময় তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে একখানা গাড়ী থামিবার আভাস পাওয়া গেল। বাড়ীর একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"আমাদের বাড়ীতে কে আস্ছে।"

নির্ম্মলা তখন স্নান সারিয়া গামছার সাহায্যে ভিজা চুলগুলি মুছিতেছিল। সেই অবস্থাতেই কৌতূহলভরে উঠানের দিকে উঁকি দিতেই সবিস্ময়ে দেখিল, যিনি আসিয়াছেন, তিনি আর কেহ নহেন, তাহারই শাশুড়ী।

চুলের সঙ্গে জড়ানো গামছাখানি সজোরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া—উঠি-পড়ি অবস্থায় সে শাশুড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল,—তাঁহার দুইখানি পা বুকে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুময় মুখখানি তাহার ভিতর গুঁজিয়া সে গাঢ়স্বরে কহিল,—"ওগো, তোমরা দেখে যাও—আমার মা এসেছেন।"

বাড়ীর সকলেই শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, কাত্যায়নীদেবী নির্ম্মলাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিয়াছে।

প্রকৃতিস্থ হইয়া আসনে বসিয়াই কাত্যায়নীদেবী কহিলেন,—"ব্যোন! তোমার মেয়ে যত দিন চোখের সামনে ছিল, তাকে চিনিনি,—চিনিছি চোখের আড়ালে আস্তে। তাই আজ তোমার বাড়ী বয়ে তাকে নিতে এসেছি।"

নির্ম্মলার মা কহিলেন,—"যে দিন দু হাত এক হয়েছে ব্যোন, সেই দিনই ত ও তোমার দাসী হয়েছে।"

কাত্যায়নী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"কিন্তু আমি যে ওকে দাসীরও বেহদ্দ ক'রে রেখেছিলুম ব্যোন,—তাই না সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।"

নির্ম্মলা কহিল,—"অমন কথা বলবেন না মা, আমি আপনার সেই দাসীই আছি। আপনাকে দেখ্‌বামাত্রই জেনেছি, দাসীকে ডাকতে এসেছেন নিজে—"

কাত্যায়নী নির্ম্মলাকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—"ভুল যে আমার ধরা পড়েছে মা, তাই না তোমাকে নতুন করে বরণ করে ভুলের মাশুল দিতে এসেছি!"

বুকের কাঁটা

দুই

এক

মেয়ের বিবাহ লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ ক্রমশঃই মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছিল।

স্বামী হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী হিসিবী মানুষ, সকল বিষয়েই চৌকস্ ও ঝানু; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথার মেধাটুকু—দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকুর মত—গাঢ় ও ঝুনো হইয়া উঠিয়াছে। এই পাকা মাথায় একবার যে সিদ্ধান্ত স্থান পায়, তাহাই পাথরের উপর লোহার আঁচড়টির মত স্থায়ী হইয়া বসে; স্ত্রীর সাধ্য কি, যুক্তি বা নজির দেখাইয়া সাব্যস্ত করিবেন—সেটি অন্যায়। 'কথায় কথায় বলেন,—হাইকোর্টের দপ্তরে এত কাল ধ'রে হিসেবের ভুল ধরা-কাযে চুল পাকালুম, কত বড় বড় কৌঁসুলীকে আক্কেল দিয়ে এলুম, আজ কি না একটা স্ত্রীলোক বলে—আমি কিছু বুঝি না, আমার বুদ্ধিতে মরচে ধরেছে, শাণাতে হবে!

এই পরিবারটিকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলা চলে। বংশের ইতিহাস ও পিতৃনিবাস পূর্ব্ববঙ্গের যে ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানটির সহিত সংসৃষ্ট থাকিবার কথা, পদ্মার দুর্ব্বার ক্ষুধায় এক রাত্রিতেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা; চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতা সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজার অঞ্চলে যে বাসা পাতেন, সেই বাসাতেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন ও সেই ছোট বাসাবাটীই ক্রমে ক্রীত, সংস্কৃত ও আয়তনে অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইয়া নিজস্ব বসতবাটীতে পরিণত হয়।

সুতরাং পরিচয়সূত্রে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যদি খাস কলিকাতাবাসী বলা যায়, তাহা অযৌক্তিক হইবার কথা নয়।

পিতা যতটা সাদাসিধা চালে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তা হইয়া তাহার অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। স্ত্রী মনোরমা দেবী বরাহনগরের এক বনেদী বংশের কন্যা; পিতা নিজে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া এই বিবাহ দিয়া যান। এক সময় মেয়ের বাবার ধনের খ্যাতি ছিল, কিন্তু বিবাহের সময় তাহারই অতীত কাহিনী, বংশগত কৌলীন্য ও মেয়েটির আশ্চর্য্যরকমের রূপলাবণ্য ভিন্ন তাহাকে পার করিবার অন্য কোনও অবলম্বন ছিল না। তথাপি বৃদ্ধ পিতা উপায়ক্ষম তরুণ পুত্রের জন্য এই পাত্রীই নির্ব্বাচন করিয়া পাত্রীপক্ষের প্রশংসার সহিত আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা সমানভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সওদায় তিনি অণুমাত্র অনুতপ্ত হন নাই, বরং জোর করিয়াই বলিতেন,—এ-ঘরে কাজ ক'রে আমি নিজেও ঠকিনি, মেয়ের বাপকেও ঠকাই নি।

কর্ত্তার এই কথাটা অনেকের মনেই ধোঁকা দিত, ইহার অর্থ-টা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া কেহ কেহ জানিতে চাহিত। কর্ত্তা শুনিয়া বলিতেন,—মানানসই ঘর-বর দেখে মেয়ে দেবে, আর সমান ঘর থেকে মেয়ে আনবে। আমি ত মন্দ কিছু করি নি; মেয়ে ভালো, মেয়ের বাপ ভালো, মেয়ের বাপের বংশ আরো ভালো, তবে পয়সা নেই; অবস্থা আমার চেয়েও এক ধাপ নীচে। তাতে বরং ভালোই হয়েছে; এমন ঘরের মেয়ে আনাই উচিত, পয়সার দিক দিয়ে তারা খাটো হলেও, বংশে ছোট নয়, মনটাও দরাজ। আমি ত তাই-ই করেছি, কাষ আমার ভালোই হয়েছে এবং আমিই জিতেছি।

এমন চাঁচা-ছোলা যুক্তির পর আর কেহ কোনও বেয়াড়া উক্তি তুলিয়া

মুরুব্বিয়ানা করে নাই, এই প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনরূপ ঘোঁট পাকিয়া উঠে নাই। বৃদ্ধ হিসাব করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার ফল ভালই হইয়াছিল। কুটুম্বের নিকট তিনিও কোনও উচ্চ আশা করেন নাই, অথচ হৃদয়বান্ কুটুম্বও তাঁহার যথাশক্তি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ হন নাই; সুতরাং দুই পরিবারের মধ্যে সহজেই এক অচ্ছেদ্য মিলন-সূত্র রচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু এই দুইটি পরিবারের বাহিরের পরিমণ্ডলটুকু নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে ভরিয়া উঠিলেও, তীক্ষ্দৃষ্টি বৃদ্ধ ক্রমশঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভিতরে গোঁল বাঁধিয়াছে এবং তাহার মূলে ছেলে হৃষীকেশ।

তখনকার এণ্ট্রেন্স পাশ করিতেই তিনি সুপারিশ ধরিয়া ছেলেকে হাইকোর্টের সেরেস্তায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। ছেলের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল—ভরসা ছিল, ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আশা আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রচুর। কিন্তু বিবাহের পর কয়েক বৎসরের ভিতরেই পারিবারিক পরিস্থিতি হইতে তিনি বুঝিলেন, ছেলের চাল বিগড়াইয়াছে, উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার যে রাস্তা তিনি তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সে তাহা ছাড়িয়া অন্য রাস্তা ধরিয়াছে। তিনি প্রথম প্রথম ছেলের ভুলটুকু ধরাইয়া দিলেন, অনেক দৃষ্টান্ত তুলিয়া উপদেশ দিলেন—সহরে বরাবর টেঁকে থাক্‌তে হ'লে, তার ঝোড়ো হাওয়া বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। জান ত, বাবা! পূবানি জোলো-হাওয়া খেতে ভালো লাগে, কিন্তু ধাতে সয় না, গা ম্যাজ-ম্যাজ করে, সখ ক'রে বেশী খেলেই শেষে বিছানায় শুইয়ে ফেলে।

ছেলে যে বদখেয়ালীভাবে কুসংসর্গে মিশিয়াছে বা নিষিদ্ধ স্থানে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। বরং এদিক দিয়া ছেলের সম্বন্ধে পিতার মনে ভাল ধারণাই ছিল। তাঁহার মনে বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, নিজেদের হাল ভুলিয়া ছেলের চাল বাড়াইয়া চলায় এবং বড়

হইবার যোগ্যতাটুকু অর্জ্জন না করিয়াই লাফাইয়া বড়দের নাগাল ধরিতে প্রয়াস পাওয়ায়।

এই দুইটি বিষয়ে বৃদ্ধের বিষম বিরাগ দেখা যাইত। প্রায়ই ছেলেকে ডাকিয়া বলিতেন,—নাম ভাঁড়ানোর মত, অবস্থা ছাপিয়ে এগিয়ে যাওয়াও মস্ত দোষের কথা। নিজের অবস্থা হিসেব ক'রে কায করতে হয়, কথা বল্‌তে হয়, মেলামেশা করতে হয়। জুতো, কাপড়, জামায় অবস্থা ঢাকা যায় না, তা হ'লে ময়ূরের পালক প'রে দাঁড়কাকও ত'রে যেতো, ধরা প'ড়ে শেষকালে বেকুব বন্‌ত না।

পারিবারিক ব্যাপারেও বৃদ্ধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ছেলের এই মনোবৃত্তিই ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তির ছায়া ফেলিয়াছে, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যেও একটা ব্যবধান রীতিমত তালগোল পাকাইয়া খাড়া হইয়া উঠিতেছে। বধূর অসামান্য রূপ ও সেই অনুপাতে নানাবিধ সদ্‌গুণ—আচার, নিষ্ঠা, গতর, আক্কেল-বিবেচনা—শ্বশুরকে মুগ্ধ করিয়াছে, তিনি বধূ-অন্ত প্রাণ, প্রতিবাসিনীদের মুখে বধূর প্রশংসা ধরে না; কিন্তু স্বামীর ধারণা, বধূ তাহার একান্ত করুণার পাত্রী; যেহেতু তাহার বাবা নির্ধনী,—বড়মানুষীর কোনও নিদর্শনই তাঁহার আচরণে পাওয়া যায় না।

ছেলের এই নীচ মনোভাবটুকুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধের চেষ্টার অন্ত ছিল না, প্রায়ই বলিতেন,—কিসে তোমার এই খুঁতখুঁতুনি, তা আমার জান্‌তে বাকি নেই। কিন্তু এ পথেও তুমি ভুল ক'রে ব'সে আছ বাবা! 'অমুক' পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের বাড়ী বিয়ে করেছে, বড় লোক শ্বশুর, যখন তখন যুড়ি পাঠান, তোমাদের চোখে তাক্ লাগিয়ে শ্বশুরবাড়ী রাজার হালে যায়, এতেই মাথা গেছে গুলিয়ে, নিজের শ্বশুরের অবস্থা ভেবে মনের ভেতর আপশোষের আগুন ধরিয়ে বসেছ! বউমা বেচারীকেও খোঁটা

দিতে কসুর নেই। ছি, ছি! এর চেয়ে বেকুবী আর নেই, এ অপরাধের বিচার চলে না, কিন্তু এর শাস্তি আপনিই এসে অবাক্ ক'রে দেয়, তখন আর ফেরবার উপায় থাকে না।

ছেলে বাপের কথা চুপ করিয়া শুনিত, কোনও প্রতিবাদ করিত না, কিন্তু রুদ্ধ রোষের অস্ত্রখানি স্ত্রীর উদ্দেশ্যেই শাণিত হইয়া উঠিত।

বৃদ্ধের ইচ্ছা ছিল, এইভাবে ছেলের দুই চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া তাহার ভুলগুলি ধরাইয়া দিবেন, কান দুটি ধরিয়া বাঁকা রাস্তা হইতে সোজা রাস্তাটিতে টানিয়া আনিবেন। কিন্তু মনের এই ইচ্ছাটুকু সমাধা হইবার পূর্ব্বেই সহসা পরপারের অদৃশ্য রাস্তায় তাঁহাকে সহসা পাড়ী দিতে হইল। মহাযাত্রার পূর্ব্বেও তিনি ছেলেকে পাশে বসাইয়া, হাত দুইখানি ধরিয়া শেষ মিনতি জানাইয়াছিলেন,—ভুল পথে চলা ছেড়ে দাও বাবা, লাফিয়ে উঁচুতে উঠ্‌তে যেয়ো না; পারো যদি, নিজের চেষ্টায় নিজেই বড় হও, তখন আর ছুট্‌তে হবে না, সবাই আস্‌বে তোমার কাছে ছুটে।

আদরিণী বধূ মনোরমার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া শেষের দুটি কথা বলিয়া শ্বশুর শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন,—আমার হাল-চালের কথা ভেবে সংসার তুমি চালিয়ো না, তা হলেই সুখী হবে।

দুই

তাহার পর বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে, শ্যামবাজারের সেই বাড়ী ও তাহার সহিত সংসৃষ্ট পরিবারটিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আয়তনও বাড়িয়াছে। ষষ্ঠীদেবী একটু বিলম্বেই চক্রবর্ত্তী পরিবারের দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেলিয়াছিলেন, সেই জন্যই চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বেই কন্যাদায়ের বিষম সমস্যা ও তাহার সমাধানের ব্যয়সঙ্কুল ব্যবস্থা হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাবপ্রবণ চিত্তে শিহরণ তুলিতে পারে নাই।

পিতার মৃত্যুর পর আরও প্রায় আঠারোটি বৎসর সেরেস্তার সেবা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের জীবনযাত্রায় পিতার অন্তিমকালের অনুরোধটুকু যে পদে পদে অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। সাধ্বী মনোরমা দেবী যে ধ্রুবতারার মতই তাঁহার চিত্তাকাশে শ্রদ্ধা-সহকারে স্থান পাইয়াছেন, তাহা ধারণা করাই ভুল। ঠিক রাস্তাটি এই আঠারো বৎসরের দীর্ঘ যাত্রায়ও তিনি ধরিতে পারেন নাই, নিজের ভুলটুকু সংশোধন করিতেও কোনও আগ্রহই তাঁহার দেখা যায় নাই।

কিন্তু পত্নী মনোরমা—তিন কন্যা ও দুই পুত্রের জননী মনোরমা শ্বশুরের শেষের কথাগুলি এখনও বেদবাক্যের মতই মানিয়া চলেন, ইহাকেই আদর্শ করিয়া তিনি তাঁহার সংসার পাতিয়াছেন, স্বামীর শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সংসারের চাল কিছুতেই পরিবর্ত্তন করেন নাই।

চাকুরী হইতে অবসর লইয়া ঘরে সুস্থির হইয়া বসিতে না বসিতেই বড় মেয়ে প্রতিমাকে পার করিবার প্রসঙ্গ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনের শান্তিটুকু সহসা ভঙ্গ করিয়া দিল। বরাহনগর হইতে শাশুড়ী লিখিয়াছেন, —বাবা, মেয়েকে আর ত ফেলে রাখা চলে না; এত দিন বলি নি, যখন ছুটীছাটা নিয়ে এসে বসেছ, শুভকাযটুকু আগে সেরে ফেলো।

দক্ষিণেশ্বর হইতে বড় শালী সুর একটু চড়াইয়া জানাইয়াছেন,—ষোলো বছরের মেয়ে তোমাদের গলায়, গলা দিয়ে ভাত নাম্‌ছে কি করে? হুঁস নেই? আর বলা-কওয়া নয়, এই মাসেই মেয়ে পার করবার পথ খোঁজ।

দুই চক্ষু পাকাইয়া চক্রবর্ত্তী তর্জ্জন তুলিয়া কহিলেন,—"কি ব্যাপার! এত কাল কি সবাই মুখ বুজিয়েছিল, ছুটী নিয়ে বাড়ীতে বস্‌তে না বস্‌তেই চারিদিক দিয়ে চেপে ধরেছ"!

মনোরমা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সহজকণ্ঠে উত্তর দিলেন,

—"বাড়ন্ত মেয়ে ঘরে থাকলেই দশ জনে দশ কথা বলে, লোকের মুখ ত আর চাপা দেওয়া যায় না ; আর, এ সব কথাও আজ নতুন নয়, তবে তুমি নতুন শুনছ বটে" !

কিন্তু স্বামী এত দিন আফিসের কাজের অছিলায় নিশ্চিন্ত থাকিলেও মনোরমা মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি তলে তলে মা ও ভগিনীদের সহায়তায় প্রতিমার উপযুক্ত এক পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিমা মেয়েটির রূপের বুঝি তুলনা ছিল না, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে এমন আশ্চর্য্য রূপ ও তদনুরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুশ্রী গঠনভঙ্গী সচরাচর দেখা যায় না। পাত্রপক্ষ মেয়ের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা স্বামীর অজ্ঞাতে পিত্রালয় হইতেই একদা দেখাশুনার প্রাথমিক কাজটুকু সারিয়া রাখিয়াছিলেন। মেয়ের রূপ এবং পাত্রপক্ষের চিরপরিচিত মেয়ের মাতামহ পক্ষের সংস্রবে উন্নত কুল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা দেনা-পাওনা সম্বন্ধেও যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মনোরমা ভাবিয়াছিলেন, যথাসময় এই সংবাদটির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া স্বামীকে চমৎকৃত করিয়া দিবেন—অক্ষম পুরুষদের সহায়তা না লইয়াও, মেয়ে-ব্যাপারে তাহারা যে গুরুতর বিষয়টির গোড়া-পত্তন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার জন্য একটা মোটা রকমের 'দালালী' অন্ততঃ মুখের 'বাহোবা' পাইবেনই !

কিন্তু এমন আশাপ্রদ সংবাদে স্বামী কিছুমাত্র চমৎকৃত হইলেন না, তাঁহার মুখে প্রসন্নতার কোনও নিদর্শনও পাওয়া গেল না ; বরং মুখখানি অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর হইয়া স্ত্রীর মুখের সকৌতুকহাসির রেখাটুকুও এক মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল।

কন্যার বিবাহের এই প্রসঙ্গে পৌরুষের অভিমান র্ব্বর সুপ্তপ্

মনোবৃত্তিকে সহসা জাগাইয়া দিল। শ্বশুরবাড়ীর প্রতি কোনও দিনই তিনি প্রসন্ন ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাদেরই চেষ্টায়, তাঁহাদেরই সম অবস্থাপন্ন পরিচিত ঘরে, তাঁহার রাজকন্যার মত রূপবতী কন্যাটিকে চালাইবার আয়োজন হইয়াছে শুনিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। গরীবের ঘরে বিবাহ করিয়া যে ক্ষতি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাঁহার কন্যাকেও ঠিক সেই পথেই অগ্রবর্ত্তিনী করিবার এই চক্রান্ত চলিয়াছে! সমস্ত মন তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, প্রখর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিলেন,—"বাঃ! প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দেবার মত দরিয়াটা তোমরা ত দিব্যি খুঁজে খুঁজে বার করেছ! চমৎকার"!

বিদ্রূপের সুরে কথার আঘাত অধিকাংশ মেয়ের অন্তরেই নির্ঘাত হইয়া ব্যথা দেয়; স্বামীর এই শ্লেষ মনোরমার বুকে সূচের মতই তীক্ষ্ণ হইয়া বিঁধিল। কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত এই শ্রেণীর আঘাত তাঁহার নিকট নূতন নহে; কথাসূত্রে এমন আঘাত আরও কত দিন পাইয়াছেন, প্রতি-আঘাত দিবার জন্য তাঁহার জিহ্বাও যে প্রখর হইয়া উঠে নাই, তাহা নয়; কিন্তু দেবতুল্য শ্বশুরের স্মৃতি, সংসারের শান্তি, উপযুক্ত সন্তানদের পরিস্থিতি ভাবিয়া কোনও দিনই তিনি কথায় কলহ বাধান নাই, নীরবেই প্রত্যেক অপ্রিয় কথাটি সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আজ এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, তথাপি নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠেই তিনি স্বামীর এই শ্লেষ-কঠোর মন্তব্যের উত্তর দিলেন,—"দরিয়া ত আমরা নিজের হাতে কাটাইনি, ভগবানই আগে থাক্‌তে কাটিয়ে রেখেছেন; এখন মেয়ের হাত-পা বেঁধে সেখানে বিসর্জ্জন দেওয়া হবে, কিম্বা মেয়ে সে দরিয়ায় নেমে মনের সুখে সাঁতার দেবে, সে সব দেখ্‌বে—বিবেচনা করবে তুমি! আমরা শুধু দেখিয়ে দিয়েই খালাস"।

এ কথার উপর আর আঘাত দেওয়া চলে না, অগত্যা উদ্যত প্রহরণ সম্বরণ করিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহসা গম্ভীরভাবেই কহিলেন,—"হুঁ! আচ্ছা, কি রকম দরিয়া, সেইটিই আগে শুনে নিই; কত জল, কতটা পরিধি, তার পর চৌহদ্দী,—এগুলো ত জানা দরকার!"

যে সুরে ও যেরূপ ভঙ্গীতে স্বামী এই কয়টি কথা কহিলেন, মনোরমা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠেই সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "—ঘর খুব ভাল, কাশীপুরের পুরোনো বাসিন্দে, বাড়ী একতলা হলেও চকমিলানো, পুকুর, বাগান এ সবও ভদ্রাসনের মধ্যে। বেলঘরের দিকে বিঘে কুড়ি ধান-জমি আছে, তা থেকে সম্বৎসরের চাল ঘরে বাঁধা, ভাতের কোনও ভাবনা নেই। ছেলেও দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, একটা পাশ ক'রে দম্‌দমার সরকারী আফিসে ঢুকেছে, চাকরী পাকা হয়ে গেছে, মাস গেলে এখন টাকা চল্লিশ পায়, শীগ্‌গীর না কি বাড়্‌বে। ঘরের কাছেই আফিস, বাড়তি খরচ ত আর নেই, সবটাই ঘরে আসে। সংসারও যেন জল্‌-জল্‌ কর্‌ছে, বাপ, মা, আরও দুই ভাই, ঝি, চাকর, গাই, বাছুর—কিছুরই অভাব নেই। মোট কথা, বেশ লক্ষ্মীমন্ত গোছালো গেরস্ত ঘর, তার ওপর হুট্‌কো যা তা নয়, জানা-শোনা"।

মনোরমা দেবী এক নিশ্বাসেই পাত্রপক্ষের ফিরিস্তি অথবা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জিজ্ঞাস্য দরিয়াটির চৌহদ্দী সংক্ষেপে সমস্তই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন।

রায় প্রকাশের পূর্ব্বে বিচারকের মুখের উপর সচরাচর যে বিচিত্র ভাবটুকুর আভাস পাওয়া যায়, তাহার অনুকরণ করিয়া তদনুরূপ ভঙ্গীতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ সম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দেশটুকু সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন, —"ওখানে প্রতিমার বিয়ে হতেই পারে না"।

স্বামীর মুখে সহসা এরূপ কথা শুনিবার প্রত্যাশা মনোরমা করেন

নাই, কথাটা তাঁহাকে বিচলিত করিল; অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া মুখের কথার উপর জোর দিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"না-হবার কারণটা কি শুনি?"

কণ্ঠের স্বর বিশেষ দৃঢ় করিয়াই স্বামী উত্তর দিলেন,—"গেরস্তর ঘর আলো করবার জন্য প্রতিমা আমার মেয়ে হয়ে আসে নি!"

কি কথায়, কি উত্তর! স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে অপলক নয়নে তাকাইয়া মনোরমা দেবী আস্তে আস্তে কহিলেন,—"কোনও রাজপুরী আলো করবার জন্যও ত মেয়ের ডাক পড়ে নি!"

রুক্ষকণ্ঠে স্বামী কহিলেন,—"চেষ্টা হয় নি তাই; এবার কসুর হবে না, ডাক পড়বেই।"

স্ত্রী বুঝিলেন, স্বামীর সহিত তর্ক করা বৃথা; শ্বশুরের খোঁটায় তাঁহার মনের মোহ এখনও কাটে নাই। মনের ভিতর অভিমান পুঞ্জীভূত হইলেও, কন্যার ভবিষ্যৎ, শ্বশুরের নির্দ্দেশ, গৃহিণীর দায়িত্ব তাঁহাকে স্বামীর এই কল্পিত অভিসন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিতে বাধ্য করিল। আবেগের সহিত তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"যাবার আগে বাবা তোমাকে ডেকে যে সব কথা ব'লে গিয়েছেন, মনে আছে?"

স্ত্রীর এই প্রশ্নে স্বামীর মনের সমস্ত জ্বালা দুই চক্ষুতে যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল, সেই জ্বালাময় দৃষ্টিতে তিনি প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমা দেবী তাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, —"যদি ভুলে গিয়ে থাক, আমি তাঁর সেই কথাগুলিই আবার না হয় বলছি।"

কর্কশকণ্ঠে চীৎকার তুলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"তুমি থামো, সে সব পুরোনো কাসুন্দী আর তোমাকে ঘাঁট্‌তে হবে না, আমার মনে আছে।"

—"তা' হ'লে সমান ঘর-বর ছেড়ে রাজপুত্তুরের খোঁজে কি দরকার ?"

—"দরকার আমার মেয়ের, দরকার আমার নিজের, আমার চিরদিনের এই সাধ; বাবার উদারতায় আমি ঠকেছি ব'লে আমার মেয়েকে কখনই ঠক্‌তে দেব না।"

শেষের দুটো কথা যেন তীরের মত বেগে মনোরমা দেবীর বুকে গিয়া বিঁধিল। মুখের দীপ্তিটুকু তাঁহার পলকে মিলাইয়া গেল। কথাটার অর্থবোধ হওয়া সত্ত্বেও, না বুঝিবার ভঙ্গীতেই মুখখানা কঠিন করিয়া বিকৃতকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"এ কথা বল্‌বার মানে ? ঠক্‌বার কথা এল কেন, শুনি ?"

পত্নীর মুখের দিকে শ্লেষপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, —"আরও স্পষ্ট ক'রে শোনাতে হবে,—সত্যই বুঝতে পারো নি ? ভালই হয়েছে, বুঝে কাজ নেই আর ! হ্যাঁ, তবে একটা কথা বুঝিয়ে দিচ্ছি; সেটা বরং মনে রেখো—আমার মেয়ে-ছেলের বিয়ের ব্যাপারে তোমার বাপের বাড়ীর লোকদের এত ব্যস্ত হবার কোনও দরকারই নেই, কেন না, ওঁদের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে, সেখানে আমি কাজ করব না কিছুতেই।"

স্বামীর এই কঠোর মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা দেবীর সুন্দর মুখখানি ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, বাষ্পার্দ্রকণ্ঠে উচ্ছ্বাস তুলিয়া কহিলেন,—"তাই হবে, আজই আমি তাদের লিখে জানাব, —কেউ যেন ওরা এ বাড়ীর কোনও কথায় আর না থাকে। তোমার যা প্রাণ চায়, তুমি তাই করো, আমি তাতে একটি কথাও বলব না—বাধা দেব না আর" !

তিন

যে মেয়েটিকে লইয়া এই মনোবাদের সূত্রপাত, তাহার কোমল মনটির কোনও অংশেই কালিমার এতটুকু দাগও পড়ে নাই। প্রতিমার স্বচ্ছ-নির্ম্মল মনটি ঠিক যেন একখানি অপূর্ব্ব কমল হীরা ; যে দিকেই ধরা যায়, সেই দিকটাই তাহার দ্যুতিতে আলো হইয়া উঠে। ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে, পারিপার্শ্বিক ব্যাপার অনেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে, সমবয়সী মেয়েদের সহিত মিশিয়াছে, মোটামুটি রকমের লেখাপড়া শিখিবারও অবকাশ পাইয়াছে, তথাপি এখনও মনে তাহার শিশুসুলভ সরলতা ; কথায় কথায় তর্ক নাই, উচ্ছ্বাস নাই, কোনোরূপ বাচালতা নাই। পিতামাতার গভীর মনোমালিন্যের মধ্যেও মেয়েটি এমন ভাবে উভয়েরই মন যোগাইয়া চলে যে, কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পায় না।

মাতা বিবাহপ্রসঙ্গে মেয়েকে কোনও দিন কোনও কথা বলেন নাই, কিন্তু পিতা এ সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ ; পত্নীকে শুনাইয়া অনেক কথাই মেয়ের সমক্ষে বলিতেন। লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিত, কিন্তু কোনও দিন এ প্রসঙ্গে একটি বাণীও ফুটে নাই।

মেয়ের বিবাহপ্রসঙ্গে নিজের মুখের কথা সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিতে পিতার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের অন্ত ছিল না ; "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" !—অবশেষে এক দিন তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাই কঠোর সত্য হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল।

মহিমপুরের রাজা মহিমারঞ্জন চৌধুরী বাহাদুরের তখন খুব নামডাক। মফঃস্বলের জমিদারীতে রাজা বাহাদুরের যেমন দপ্‌দপা, কলিকাতা সহরেও

তেমনই অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিষ্ঠা। কনিষ্ঠ কুমারের বিবাহ-ব্যাপারে রাজা বাহাদুর এ সময় সপরিবার তাঁহার চৌরঙ্গীর প্রাসাদে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন। বিপুল সমারোহে পাত্রী নির্ব্বাচন-পর্ব্ব চলিতেছিল। রাজা বাহাদুরের বংশে পুরুষানুক্রমে এ প্রসঙ্গে রূপের আদরই সমধিক। স্বজাতীয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীই এ পর্য্যন্ত এই বংশে বধূর সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং কনিষ্ঠ কুমারের সম্বন্ধেও রূপসীশ্রেষ্ঠা কুলকন্যার যাচাই প্রসঙ্গে তদ্বিরের অন্ত নাই।

সংবাদটা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কর্ণে দৈববাণীর মতই উল্লাসমধুরভাবে প্রবেশ করিল। বুঝিলেন, এত দিনে তাঁহার অন্তর-দেবতার রুদ্ধদ্বারটি বুঝি উন্মুক্ত হইয়াছে; সিদ্ধিলাভে আর বিলম্ব নাই। তৎপরতার সহিত যথা-বিধানে কন্যার আলেখ্য রাজদরবারে দাখিল করা হইল, নিজের ন্যায্য মর্য্যাদা ও অখ্যাত পরিচয়টুকুর উপর কল্পিত খ্যাতি-গৌরবের অলঙ্কার পরাইয়া নানারূপ সুপারিসও চলিল। কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না; এ ক্ষেত্রে কন্যার অসামান্য রূপই যেমন পাত্রপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু, অপূর্ব্ব রূপের প্রভায় লক্ষ্য বেধ করিয়া সকল রূপসীর পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতাটুকুও ছিল শুধু তাঁহারই কন্যা প্রতিমার। সুতরাং রাজনিকেতনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হইয়া গেল, হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীই বধূর সম্মান পাইবার অধিকারিণী, চাক্ষুষ দেখা-শুনার পর এই ব্যবস্থা পাকা ও বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইবে।

এই সুসংবাদ পাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কি আনন্দ! নিজের অবস্থা ছাপাইয়া কন্যা দেখার দিন তিনি যে আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়বহুল আয়োজন করিলেন, তাঁহার ন্যায় ছপোষা গৃহস্থের পক্ষে তাহা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই অযৌক্তিক।

নিজের অতি সাধারণ বাসভবনে ত আর মহিমপুরের রাজা ও তাঁহার পরিজনবর্গের অভ্যর্থনা করা চলে না, কাযেই এই সূত্রে সন্নিহিত একখানা প্রাসাদোপম প্রকাণ্ড বাড়ী অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মোটা টাকায় ভাড়া করা হইল এবং বাড়ীর আয়তনের অনুপাতে এমন নিখুঁত পারিপাট্যে আধুনিক প্রথায় তাহার প্রসাধন চলিল যে, রাজাবাহাদুরেব চৌরঙ্গীর প্রাসাদের সহিত যাহাতে টক্কর দিতে পারা যায়, রাজ-অভ্যাগতেরা যেন ইহাও সাব্যস্ত করিতে পারেন—যে মেয়েটিকে দেখিয়া তাঁহারা বধূর মর্য্যাদা দিতে আসিয়াছেন, তাহার বাবার মর্য্যাদাও সামান্য নয়।

বিপুল ব্যয়বাহুল্যে অনুষ্ঠিত কন্যা দেখা ও বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। পনেরো দিন পরেই শুভ-বিবাহ। রাজাবাহাদুর জানাইলেন, কন্যাপক্ষ হইতে কোনরূপ পণ বা দান লইবার পক্ষপাতী তিনি নহেন। তবে এ ক্ষেত্রে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন অবস্থাপন্ন ও এমন প্রতিষ্ঠাবান্, তখন কন্যাদানসূত্রে যৎসামান্য আনুসঙ্গিক দানের সুযোগটুকু হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে তিনি অনিচ্ছুক। অতএব পাত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ এগারোখানি মোহর এবং কন্যার আভরণের মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত লোহা, হাতের ও গলার দুই প্রস্থ মাত্র অলঙ্কারই যথেষ্ট। অন্যান্য অলঙ্কার বিবাহ-বাসরেই রাজবাড়ী হইতে আসিবে ও কন্যাকে সুসজ্জিত করা হইবে। রাজ-বৈবাহিকের এই যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সানন্দেই সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর পান-ভোজনের বিরাট পর্ব্ব। ভোজ্যের শতাধিক 'মেনু' রাজ-বাড়ীর আয়োজনকে সদর্পে অতিক্রম করিয়া চলিল।

ভোজনান্তে বিদায়-গ্রহণের সময় রাজাবাহাদুর প্রসন্ন-ভাবে তাঁহার অবশিষ্ট বক্তব্যটুকুও জানাইয়া দিলেন,—বিবাহরাত্রে বরপক্ষের জনসংখ্যা সাত শত আন্দাজ হইবে। দেখার দিনটিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহরাত্রেও বরানুগমন করিয়া ঐ সাত

শত অতিথি যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে ও আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হইবেন, সে বিশ্বাস তাঁহার আছে।

অবশ্য, রাজ-বৈবাহিকের এই বিশ্বাসটুকু পরিপূর্ণভাবেই বজায় রাখিতে বিবাহবাসরেও চক্রবর্ত্তী মহাশয় চেষ্টা, যত্ন, ব্যয় ও আয়োজনের কোনও ত্রুটিই করেন নাই। রাজপুত্রের হাতে কন্যাদান করিতেছেন, রাজবাড়ীর সহিত কুটুম্বিতার যোগসূত্র রচিত হইল, অতঃপর তিনি মহিমপুরের রাজার বৈবাহিক,—এই সকল অহমিকা মদের নেশার মত তখনও তাঁহাকে নাচাইতেছিল, দৃষ্টি তখনও বাহিরে—দশ জনের দিকে, আমন্ত্রিত যাবতীয় আত্মীয়স্বজনের মুখে; তাঁহার এই বিপুল সৌভাগ্যসূত্রে বিস্ময়ের ছটা তাহাদিগকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়াছে, তাহা দেখিতে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে নিজের সত্যকার যে বিবেকটুকু বিমর্ষভাবে মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে দিকে বাহিরের গর্ব্বভরা সেই চটুল দৃষ্টিটুকু নিক্ষেপ করিবার মত অবসরটুকুও তিনি পান নাই, কিম্বা হয় ত ইচ্ছা করিয়াই চাহেন নাই।

কিন্তু যখন চাহিলেন, উৎসব তখন ভাঙিয়া গিয়াছে। নানা রত্নালঙ্কার ও মহার্ঘবসনে সুসজ্জিতা কন্যার মর্ম্মস্পর্শী বিদায়-দৃশ্যটি বাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষুর উপর তখনও ছায়ার মত ভাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি যতই পরিষ্কার ও প্রখর হইতেছিল, একে একে আরও কত অবাঞ্ছিত ঘটনার ছায়া তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া পলে পলে যেন ভীতিপ্রদ কদর্য্য মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবার শিহরিয়া উঠিলেন; দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন, কন্যা চলিয়া গিয়াছে; শেষের যে পদচিহ্নটি রাখিয়া গিয়াছে, সে চিহ্নটির দিকে ফিরিয়া চাহিবার অধিকারটুকুও ত আর তাহার নাই! তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করিয়াছেন, অতীতের অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত

সম্বন্ধটুকু যেন সবলে ছেদন করিয়াই রাজা বাহাদুর তাঁহার বধূকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া গেলেন! বিবাহের পরদিনই তিনি রাজ-বৈবাহিকের আচরণে বুঝিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে অবস্থাগত যে ব্যবধান দুই পরিবারের মধ্যে ছিল, তাহা ঠিকই আছে, কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া যে যোগসূত্র তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার দৃঢ়তা কিছুমাত্র নাই এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া এই পরিবারকে রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

অথচ, কি উচ্চপণেই এই কল্পিত গৌরবটুকু তিনি আহরণ করিয়াছেন! বিপুল ঘটায় এই বিরাট বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিতে আজ তিনি প্রায় সর্ব্বহারা! সঞ্চিত অর্থের শেষ মুদ্রাটি পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহার উপর দেনার পরিমাণও উপেক্ষা করিবার নয়। পত্নী মনোরমা নিরাভরণা হইয়াছেন, বাড়ীখানিও বাঁধা পড়িয়াছে। ব্যয়ের অনুপাতে হিসাব করিতে বসিলে বেদান্তের অখণ্ড ব্রহ্ম তাঁহার দৃষ্টির পরিধির মধ্যে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিতে থাকেন।

এখন মনের উপর নিবিড়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে পিতার শেষের কথা, স্ত্রী মনোরমার মিনতি,—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা, ঘর-বর দেখিয়া মিলাইয়া মেয়ে দিবার—কুটুম্বিতা করিবার নির্দ্দেশ! কিন্তু এ কথা তিনি বরাবরই দুর্ব্বার দম্ভে উপেক্ষা করিয়াছেন। আজ উদ্বেলিত মনটির উপর ক্ষণে ক্ষণে বুদ্‌বুদের মত এক একটি অস্থায়ী গোলক ভাসিয়া উঠিয়া সহসা স্মরণ করাইয়া দেয় কাশীপুরের সেই পাত্রটির কথা। কিন্তু এ চিন্তাই এখন বৃথা, কোনও সার্থকতাই ত আর নাই।

স্ত্রী মনোরমা কন্যার বিবাহপ্রসঙ্গে কোনও বিরুদ্ধ কথাই কহেন নাই, নির্ব্বিচারে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, মুখটি রুদ্ধ করিয়া সমস্তই সহিয়াছেন। স্বামীর সম্মান রক্ষা করিতে গায়ের গহনাগুলি অম্লান-বদনে

খুলিয়া দিয়াছেন, কোনও প্রতিবাদ তুলেন নাই, স্বামীর সম্মুখে নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত নিঃশব্দেই ত্যাগ করিয়াছেন। এখন স্বামী আর্ত্তস্বরে আবেগের ভরে বলেন,—"ওগো, তুমি কেন চুপ ক'রে সহেছিলে, কেন বাধা দাওনি —কেন দাওনি" ?

মনোরমা দেবী স্বামীর দিকে দীর্ঘায়ত দুই চক্ষু মেলিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দেন,—"দিইনি, তাই এখনও বাড়ীখানার ভেতর মাথা গুঁজে রয়েছি"।

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত স্বামী আক্ষেপ করেন,— "বুঝেছি, তা হ'লে জেদ আরো চ'ড়ে যেতো, বাড়ীখানার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকত না"।

চার

মানুষের ইহাই চিরন্তন স্বভাব,—এক সময় যাহাকে পরম প্রিয় ও একান্ত প্রেয় ভাবিয়া সবলে আঁকড়াইয়া ধরে, আবার সেইখানেই গুরুতর আঘাত পাইয়া সেই কাম্যকেই ভয়াবহ সাব্যস্ত করিয়া বসে।

কন্যার বিবাহের পর একটি বৎসর কালসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহবাসরের ব্যয়বহুল স্মৃতি ভিন্ন আর কোনও প্রীতিকর নিদর্শনই চক্রবর্ত্তী পরিবারের আশাহত বক্ষে রেখাপাত করিতে অবশিষ্ট নাই।

প্রতিমাকে একটিবার আনিবার জন্য কত প্রয়াস পাইয়াছেন, কত সাধ্যসাধনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজবৈবাহিকের ভবনে কন্যাদর্শনের কত আশা লইয়া কতবারই গিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারই যে আশা তাঁহার মিটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। রাজার বৈবাহিক তিনি, রাজপুত্রের শ্বশুর, রাজবধূর পিতা, তথাপি রাজান্তঃপুরে তাঁহার প্রবেশের কি কঠিন বাঁধা-ধরা অতি-সন্তর্পণ ব্যবস্থা! চক্রবর্ত্তী

মহাশয় স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবেন—তিনি যেন প্রেসিডেন্সী জেলের নিভৃত অংশে সুরক্ষিত কোনও রাজ-কয়েদীর সহিত দেখা করিতে চলিয়াছেন! আবার ভাগ্যক্রমে দেখা হইলেও দীর্ঘক্ষণ স্থিতির সম্ভাবনা বিরল, মেয়ের সহিত মন খুলিয়া সকল কথা যে কহিবেন, তাহার কথা শুনিবেন, তাহারও উপায় নাই; মেয়েরও এ সম্বন্ধে আগ্রহের অভাব হতভাগ্য পিতাকে মর্ম্মাহত করিয়া তুলে। এমন ক্ষেত্রে বৎসরে কয়েকবার যাতায়াত ও দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভবপর? বরং শুদ্ধান্তের এই গোলকধাঁধার বাহিরে আসিয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আশ্বস্ত হইবার অবকাশ পান।

বাড়ী ফিরিয়া এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কত কথাই বলেন, স্ত্রী গম্ভীর হইয়াই শুনেন, একটি অনুযোগও এই সূত্রে স্বামীর উদ্দেশে তাঁহার মুখ ফুটিয়া বাহির হয় না। কিন্তু মনের মধ্যে কন্যা অদর্শনের যে ব্যথা পলে পলে তিনি অনুভব করিতেন, সহ্য করিতে অষ্টপ্রহর যে যুদ্ধ চালাইতেন, অন্যে তাহার কি সন্ধান রাখিবে? এখন সহসা তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন একটি বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বয়স আরও কতকগুলি বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

ইদানীং অনেক দিন রাজবাড়ীর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, মায়ের মন সর্ব্বদাই বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল; চোখের দেখা না হইলেও, ভাল থাকার খবরটুকুই যে মায়ের প্রাণে একটা গভীর শান্তি ও সান্ত্বনা আনিয়া দেয়।

ঠিক এই সময় রাজাবাহাদুরের এক পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সপরিবার বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইলেন। আমন্ত্রণ সম্বন্ধে রাজবাড়ীর আদপকায়দা ও বিধিব্যবস্থার কোনও অসদ্ভাব দেখা গেল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিমর্ষ চিত্তটি সহসা যেন উল্লাসে ভরিয়া

উঠিল, বিবর্ণ মুখে বহুদিন পরে পুনরায় হাসি দেখা দিল। রাজ-বৈবাহিক পরিজন পাঠাইয়া যথাবিহিত শ্রদ্ধা সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সপরিবারের উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবেই অনুরোধ জানাইয়াছেন। সুতরাং এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হইবে। স্ত্রীকে কহিলেন, "মেয়ের জন্য ভাবছিলে, ভগবান্ সাক্ষাতের উপায় ক'রে দিলেন। এমনও হ'তে পারে, রাণীকে ব'লে ক'য়ে মেয়েটাকে দিনকতকের জন্য পাঠাবার কথা বলবার ফুরসৎও হয় ত পাবে।"

মেয়ের জন্য মায়ের মনে যত আগ্রহই থাক, রাজ-বাড়ীতে যাইবার আগ্রহ তাঁহার মোটেই ছিল না। কিন্তু স্বামী না-ছোড়-বান্দা। যাওয়া সম্বন্ধে কোথায় প্রতিবন্ধক, তাহা অনুমান করিয়া স্ত্রী-কন্যাদের উপযোগী সস্তার চটকদার কিছু কাপড়-চোপড়ও আনিয়া ফেলিলেন। পরিচিত এক ধনী বন্ধুর বাড়ী হইতে স্ত্রীর জন্য গাছ কতক চুড়ি ও গলার হার এক অহোরাত্রের কড়ারে চাহিয়া আনিলেন। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনোরমা দেবীকে বৈবাহিক-বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

সেকেণ্ড্ ক্লাসের একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সপরিবার যখন রাজ-বাড়ীর দেউড়ীর সান্নিধ্যে আসিলেন, তখন আমন্ত্রিতদের আগমন সুরু হইয়া গিয়াছে। বড় বড় চক্ষু-চমৎকারী প্রাইভেট-কার দেউড়ীতে আসিতেই তক্‌মাধারী বরকন্দাজদের সুবেশধারী আরোহীদের উদ্দেশে সবিনয়ে কি কুর্নিশের কায়দা! মহিলাদের ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য সুবেশধারিণী পরিচারিকাদের কি সযত্ন ব্যবস্থা! দেউড়ী হইতে প্রায় দশ হাত তফাতে পনের মিনিট প্রতীক্ষা করিবার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের দুইটি শীর্ণকায় অশ্ববাহিত ভাড়াটিয়া রথখানি দেউড়ীতে আসিয়া লাগিল, তখন প্রহরীদের মুখে উৎসাহের কোনও চিহ্নই ফুটিল না বা এই গাড়ীখানির ভদ্র আরোহিণীগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে কোনও

মহিলাকেই ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল না। অগত্যা চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজেই তদ্বির করিয়া তাঁহাদিগকে অন্দরমহলে চালান করিয়া দিলেন।

উপরের সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে তখন রীতিমত উৎসব চলিয়াছে, সহরের উপাধিধারী বহু রাজা, ভূস্বামী ও পদস্থ রাজপুরুষদের সমাগমে ঘরখানি জমজমাট। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি সন্তর্পণেই এই আসরে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামী রাজাবাহাদুর তাঁহাকে দেখিয়া হাত তুলিয়া আহ্বান করিলেন,—"আসুন, ব্যেইমশাই, আসুন, বসুন।"

রাজা-বাহাদুরের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ বৈবাহিক কুসুম নগরের মহারাজা শ্যামাকান্ত রায় চৌধুরী, বামে যিনি ছিলেন, তিনিও সম্প্রতি রাজা-বাহাদুর হইয়াছেন, আজিম নগরের জমিদার রাজা-বাহাদুরের এক কন্যার শ্বশুর; ইহাদের পরেই যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও এক এক জন দিক্‌পালবিশেষ।

পরমাত্মীয়দের পরিচয় দিতেই তাঁহারাও এই নবাগত অভ্যাগতটির পরিচয় জানিতে উৎসুক হইলেন। রাজা বাহাদুর মুখ টিপিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—"ইনি আমার নূতন বৈবাহিক।"

অনেকগুলি চক্ষু একসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের দিকে নিবদ্ধ হইল, এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে একাধিককণ্ঠে প্রশ্নও উঠিল,—

—"কোথায় থাকা হয়?"

—"বিষয়কর্ম্ম?"

—"ইনি কোথাকার—?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চক্ষুর উপর তখন সেই সুসজ্জিত জনপূর্ণ হল-ঘরটি যেন ঘুরপাক্ খাইতেছিল।

রাজা-বাহাদুর এ বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কহিলেন,—

"ইনি এখানকারই, অর্থাৎ কি না, খাস্ ক্যাল্‌কেসিয়া, শ্যামবাজার অঞ্চলে থাকেন। নাম – হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী।"

সকৌতুকে আর এক কণ্ঠে প্রশ্ন উঠিল,—"চক্রবর্ত্তী? আচ্ছা, তা হ'লে লেট্ জাষ্টিস্ চক্রবর্ত্তী ফ্যামিলির—"

রাজা-বাহাদুর প্রশ্ন-কর্ত্তার কথায় বাধা দিয়াই উত্তর দিলেন,—"না, না, ও-সব কিছু নন ইনি, পুয়ার চ্যাপ,—অতি নিরীহ বেচারা,—এঁরই কন্যার সঙ্গে গেল বছর জানকীর বিয়ে হ'ল না! খাসা এঁর মেয়েটি কিন্তু,—কে বলবে যে য়িহুদীর মেয়ে নয়!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষমধ্যে চাপা হাসির অস্ফুট ধ্বনি উঠিল; পরিহাসের সুরে একজন কহিলেন,—"ইনি তা হ'লে রীতিমত এক জন 'ওয়াণ্ডারিং জু' বলুন"!

আর এক জন আড়-নয়নে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বদনের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"ও আই সী"!

অতঃপর এই নবাগত মানুষটির দিকে আর কাহাকেও কোনও মনোযোগ দিতে দেখা গেল না। আলোচনা পূর্ব্ববৎ চলিল, নব নব বহু অভ্যাগতের আগমন এবং পরিচয়ের আদান-প্রদানও হইল, কিন্তু এ সমস্তই শ্যামবাজার অঞ্চলবাসী 'পুয়ার চ্যাপ্' হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যেন অতি সন্তর্পণে পরিবর্জ্জন করিয়াই!

পাঁচ

দ্বিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষের সম্মুখে সকন্যা মনোরমা দেবীকে আনিয়া পরিচারিকা কহিল,—"এই ঘরেই রাণী আছেন, আপনার মেয়েও বোধ হয় আছেন, ভেতরে যান, মা!"

রাখিয়াই সে তাহার কার্য্যে চলিয়া গেল। মনোরমা দেবী দুই কন্যার সহিত পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, সুদৃশ্য সোফায় আসীনা মহিলাদের চমকপ্রদ রূপ ও অপরূপ বসন-ভূষণের দ্যুতিতে ঘরখানি যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে।

নবাগতদের দিকে কৌতূহলাবিশিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রাণী প্রশ্ন করিলেন, —"আপনারা?"

মনোরমা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা অণিমা ব্যগ্র-উল্লাসে কহিয়া উঠিল,— "অ মা, ঐ যে দিদি ব'সে!"

কিশোরী কন্যাটির কথায় তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। রাণী দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—"আপনি বৌমার মা, শ্যামবাজার থেকে আস্‌ছেন!—নমস্কার, বসুন, বসুন,—বৌমা, মাকে আগে গড় কর!"

প্রতিমা এই কক্ষেই ছিল, মা ও ভগিনীদের আবির্ভাব বোধ হয় তাহার আকুল চক্ষু দুটিকে সর্ব্বপ্রথমেই আকৃষ্ট করিয়াছিল, এ অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধেও তাহার বিবেকবুদ্ধি সচেতন ছিল, কিন্তু তথাপি রাজ-প্রাসাদের এই রাজবধূটি যে তারের পুতুলের মত নিস্ক্রিয়, বাঁধা তারে টান না পড়িলে তাহার কোনও সত্তাই নাই, হাত মুখ পা ও ইন্দ্রিয়সমূহ থাকিতেও যথাযথ চালনায় স্বাধীনতার অভাব,—তাহা কে উপলব্ধি

করিবে? বহু দীর্ঘদিবসের পর কন্যার এই বিসদৃশ আচরণ সম্বন্ধে স্নেহাতুরা জননী মনে যদি বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন, তাহা কি দোষের হইবে?

রাণীর কথায় বধূ উঠিল, অতি ধীরে ও রীতিমত গাম্ভীর্য্য সহকারে অচপল ভঙ্গীতেই বধূ উঠিল। মায়ের দিকে কন্যার গতির ভঙ্গী দেখিলেই মনে হয়, পদচালনার এই ছন্দটুকুও বধূকে বহু আয়াসে শিক্ষা করিতে হইয়াছে এবং এ বিষয়েও তাহার এক চুল এ-দিক্ ও-দিক্ হইবার যো নাই!

শুধু মায়ের চরণে নয়, অন্যান্য গুরুজনদের চরণেও বধূকে মাথা নত করিতে হইল। মনোরমা দেবী সস্নেহে মেয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাণীর আদেশে বধূ মায়ের পাশের সোফাখানিতেই বসিবার অধিকার পাইল বটে, কিন্তু কথা কহিবার—কোনও কিছু জানিবার বা জানাইবার কোনও অবসর মিলিল না।

বধূর প্রসঙ্গ তুলিয়াই রাণী আমন্ত্রিতা বৈবাহিকাকে আপ্যায়িতা করিতে বসিলেন, প্রথমেই কহিলেন,—"দেখুন, আপনার মেয়ের রূপ থাক্‌লে কি হবে, শিক্ষা কিছুই পায় নি; কি কষ্টই যে পেয়েছি আমি ওকে তৈরী ক'রে তুলতে, তা আর কি বলব!"

মনোরমা দেবী বিবর্ণমুখে রাণীর মুখের দিকে শুধু চাহিলেন, কথা একটিও কহিলেন না।

উৎসাহ সহকারে রাণী পুনরায় কহিলেন,—"আমাদের রাজা রূপ-রূপ করেই পাগল, কিন্তু তার সঙ্গে কুলটাও যে দেখা কত দরকার, এ কথা কেউ তাঁকে বোঝাতে পারে নি; এখন বুঝছেন হাড়ে হাড়ে!"

রাণীরই সমবয়সী এক বর্ষীয়সী নারী রাণীর সুরের যেন অনুকরণ করিয়াই কহিলেন,—"তা কথাটা মিছে নয়, শুধু রূপই কি সব? আরও দশটা দেখ্‌তে শুন্‌তে হয় বৈ কি! আচার-ব্যবহার, চলা-ফেরা হাল-চালের ধারা—"

রাণী এবার মুখের কথায় রীতিমত জোর দিয়াই কহিলেন,—"নিশ্চয় ! বৌমা প্রথম যখন আসেন, তখনও আপনারা দেখে্ছেন, মুখ টিপে হেসেছেন —তাও জানি ; আবার এখনও দেখছেন ত কত তফাৎ হয়েছে ! এখন কেউ হঠাৎ দেখে বল্‌তে পারবে, বৌমা ওঁরই মা-বোনের পাশে ব'সে আছেন !"

অনেকগুলি কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি একই সঙ্গে বৌমা এবং তাহার মা ও বোন দুইটির মুখের উপর সার্চ্চ লাইটের প্রখর রশ্মির মত খরবেগে পড়িল, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে ক্ষোভ বা ব্যথার যত বড় দুর্ব্বার পাথারই তরঙ্গায়িত হইয়া উঠুক না কেন, উপরে তাহার একটি বুদ্‌বুদ্ উঠিবারও নিদর্শন পাওয়া গেল না।

রাণী এই সময় সহসা কথার মোড় ফিরাইয়া মনোরমাদেবীর দুই কন্যাকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"বৌমার পরেই বুঝি এই দুটি মেয়ে ?"

মনোরমা দেবী মৃদুস্বরে উত্তরে দিলেন,—"এদের ওপরে তিনটি ছেলে, তার পর—"

তার পরের কথা শুনিতে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া খপ্ করিয়া মনোরমা দেবীর মুখের কথায় বাধা দিয়া রাণী কহিয়া উঠিলেন,— "কিন্তু ওদের ও কি পরিয়েছেন বলুন ত !"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে মনোরমা দেবী নিরুপায়ের মত চাহিলেন মাত্র ! এমন প্রশ্ন যে উঠিতে পারে এবং তাহার উত্তর দিবার জন্য তাগিদ পড়ে, এ রহস্য তাহার জানা ছিল না।

কিন্তু রাণীর আর এক সঙ্গিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "আপনি ও বস্তু চিনবেন না, ওর নাম আর্ট সিল্ক, নতুন বেরিয়েছে ; শুনিছি, কলা গাছের বাস্‌না থেকে ওর উৎপত্তি—সোনার পাথরবাটি আর কি !"

কথাটা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন ; রাণী মুখখানি সহসা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—"তা হবে, কিন্তু ওরকম কাপড় প'রে এ ঘরে আর কোনো দিন কেউ আসেনি কি না, তাই প্রথম এরা ঢুক্‌তেই অবাক্ হয়ে ভাব্‌তে হয়েছিল—কারা এলো।"

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা এক ধনবতী এতক্ষণ তাঁহার প্রখর দুই চক্ষু স্থির দৃষ্টি মনোরমা দেবীর হাতের চুড়িগুলির উপর প্রয়োগ করিয়া যেন কোনো গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিলেন, রহস্যটুকুর সন্ধান পাইতেই তাঁহার চাঁপাফুলের পাপড়ীর মত সুগোল আঙ্গুলটি চুড়িগুলির দিকে হেলাইয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করিলেন—"এগুলোও কি কোনো অভিনব আর্টের নূতনতর আবিষ্কার ? কিসের বলুন ত ?"

মনের বিরুদ্ধ ভাবটুকু সবলে চাপিয়া উদাসভাবেই মনোরমা দেবী উত্তর দিলেন,—"বোধ হয় সোনারই হবে !"

প্রশ্নকারিণী ইহার উত্তরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু ভেতর থেকে ওরাই যে শাদা দাঁত বার ক'রে সোনাকে ভেঙ্গ্‌চী কাটছে !"

আবার সমপর্য্যায়ভুক্তাদের মুখে সকৌতুক হাসির উচ্ছ্বাস এবং চক্ষুর খরদৃষ্টির দুর্ব্বার আঘাত !

সুসজ্জিত ঘরখানির কার্পেটমণ্ডিত মেঝেটির বুকে যদি সেই মুহূর্ত্তে একটু ফাটল দেখা যাইত, মনোরমা দেবী নির্ব্বিচারে দেহখানি তাহার মধ্যে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন ! স্বামীর বন্ধু যে রূপার উপর সোনার কলাই ধরানো চুড়িগুলি সোনার বলিয়া ধার দিয়াছিলেন, তিনি তাহা কল্পনাও করেন নাই ! যে ভুল তাঁহার অসন্দিগ্ধ চক্ষুকে অনায়াসে প্রতারিত করিতে পারিয়াছিল, তাহাই এক মুহূর্ত্তে এক অপরিচিতার চক্ষুতে ধরা দিয়া এতগুলি সন্দিগ্ধচিত্তা নারীর সমক্ষে তাঁহাকে যেন একেবারেই হতশ্রী করিয়া দিল।

রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া এবং এই সূত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষই রীতিমত শিক্ষা লইয়া গৃহে যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। আরও পূর্ব্বে ইঁহারা ফিরিতে পারিতেন, কিন্তু রাজপ্রাসাদে সাধারণের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা যতটা কৃচ্ছসাধ্য, তথা হইতে নিগম ও প্রস্থানও সেই পরিমাণে দুঃসাধ্য; সুতরাং অত রাত্রে ভাড়াটিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়া সপরিবার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব ঘটিবারই কথা।

উপরের ঘরটির মধ্যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই উপস্থিত। আজ উভয়ের ভাবভঙ্গীই এক। শ্রীহীন বিবর্ণ মুখ, নিরতিশয় ক্ষোভে শিরাগুলি স্ফীত, মাথার চুল রুক্ষ, চক্ষু নিষ্প্রভ, কাহারও মুখে কথা নাই; অথচ বুকের ভিতরে কথার অন্ত ছিল না।

কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটিল। তাহার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ম্লান মুখের ভাবটুকু ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তিনি সহসা উচ্ছ্বাসের সুরে কহিলেন,—"সমস্ত জীবনের ভুল আজ সবটাই ধরা প'ড়ে গেছে; এত কাল এই ভুল-আহ্লাদের পথেই আমি চোখ বুজিয়ে ছুটেছিলুম। এইবার শেষ।"

স্বামীর কথায় সহসা শিহরিয়া উঠিয়া মনোরমা দেবী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে আর্ত্তস্বরে কহিলেন, —"আমার সর্ব্বক্ষণই মনে হয়, বাবা স্বর্গে ব'সে সব দেখ্‌ছেন, সবই শুন্‌ছেন; তাঁর মুখের সব কথাই একটি একটি করেই ত ফলে গেলো। পারো ত, আগে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, যাতে এর বেশীও দুর্গতি না হয়"।

—"এর বেশী আরো কি দুর্গতি হবে বল? মানুষ মানুষকে যে এমন অপমান করতে পারে আর মানুষও যে তা সইতে পারে, তা ত জানতুম না! তুমি ত তবু প্রতিমাকে চোখে দেখে এসেছ, কিন্তু আমি? ও!"

অশ্রুস্ফীতনয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মনোরমা দেবী কহিলেন,—"হাঁ, প্রতিমাই দেখে এসেছি, পূজো-বাড়ীতে গিয়ে সবাই যেমন দেখে। একটা কথা শুনলুম না তার মুখে, আস্বার সময় তার সেই ডাগর দু'চক্ষু ডব্‌ডবিয়ে যখন চাইলে, সে চাহনির কথা কি তোমাকে বল্‌ব! যেন তার মনের সমস্ত কথা ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছিল ঐ দুটো চোখে, একবার শুধু 'মা' ব'লে ডেকেই ফুঁপিয়ে উঠল! অমনি চারদিক্ থেকে ডাইনীরা সব হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল! আমি যে তা ভুল্‌তে পারছি না,.ওগো, কিছুতেই যে আজ আর মনকে ধ'রে রাখ্‌তে পারছি না গো!"

অশ্রুর উদ্দাম আবর্ত্তে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কণ্ঠ তখন রুদ্ধপ্রায়, ভগ্নস্বরে অতিকষ্টে কহিলেন,—"তোমার প্রতিমাকে আমি যে জোর করেই বিসর্জ্জন দিয়েছি; খুন করেছি আমি—খুন করেছি, মেরে ফেলেছি মেয়েটাকে;—আমাকে শাস্তি দাও তোমরা সকলে মিলে—ওগো, শাস্তি দাও, যা মুখে আসে, তাই বলো, ধ'রে মারো! ওহহ,—প্রতিমা রে! মা আমার—"

পিতার আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া ছেলে-মেয়ে সকলেই শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল,—"পিতার অবস্থা তাহাদেরও আর্ত্ত করিয়া তুলিল"।

ছোট মেয়ে অনিমা এই সময় চক্ষুর অশ্রু মুছিয়া গলাটি পরিষ্কার করিয়া কহিল,—"দিদি আমার সঙ্গে একটিবার শুধু কথা কয়েছিল বাবা!"

পিতা-মাতা উভয়েই সাশ্রুনেত্রে মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

অনিমা কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কহিল,—"দিদি চুপি চুপি বল্‌লে,—বাবাকে বলিস্ অনি, আমি যে তাঁদের বুকের কাঁটা হয়েছিলুম, কাঁটা যখন তুলে রাজবাড়ীর বাগানে ফেলে দিয়েছেন, তখন আর তার ওপর মায়া কেন? কাঁটা চিরকাল কাঁটাই থাকে, ব্যথা দেওয়াই যে তার স্বভাব।"

স্বামী স্ত্রী উভয়েই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মনোরমা দেবীর কথা অশ্রুর প্রাবল্যে পথ হারাইয়া ফেলিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই বিপুল আবর্ত্তের

মধ্যে আর্ত্তরোল তুলিলেন,—"বুকের কাঁটা, "বুকের কাঁটা, ওরে প্রতিমা, ওরে —ওরে—ঠিক বলেছিস্ মা, ঠিক বলেছিস্, আমি তোকে বুকের কাঁটাই ভেবেছিলুম তখন, আর আজও ভাবছি তাই, সত্যিই তুই এখনও আমাদের বুকের কাঁটা! এই কাঁটা দিয়েই সারা জীবনের মস্ত ভুলটা ভেঙে দিয়েছিস্ মা, এখন আমাদের চোখের জলই সেই ভুলের মাশুল!"

নতুন খাতা

তিন

এক

আফিস হইতে ফিরিয়া রজনী রায় সবেমাত্র জুতাজোড়াটি ছাড়িয়াছেন, এমন সময় কন্যা কমলা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"বাবা! এগারখানা চিঠি এসেছে আমাদের, এই দেখ—"

একতাড়া চিঠি সে পিতার সম্মুখে ছোট হাতখানিতে তুলিয়া ধরিল। লাল ও গোলাপী কাগজে ছাপা চিঠিগুলি যদিও নিমন্ত্রণের আহ্বান আনিয়াছিল কিন্তু আদালতের সমনের মত সেগুলি যে কিরূপ অব্যর্থ ও অপরিহার্য্য, তাহা অনুমান করিয়া শুষ্ককণ্ঠেই রায়মহাশয় কহিলেন—"নতুন খাতার পরোয়ানা মা,—কাল বাদে পরশু!"

ছেলে সজনীও ছুটিয়া আসিয়াছিল; গর্ব্বিত উল্লাসে সে কহিল—"এতগুলো চিঠি শুধু আমরাই পেয়েছি বাবা! আমি হিসেব করে রেখেছি, চিঠি পিছু আধ সের করে মিষ্টি এলেও, এগার জায়গা থেকে সাড়ে পাঁচ সের খাবার আসবে,—কি মজা!"

সজনী সেভেনথ্ ক্লাসে পড়ে, আঁকে তার কচি মাথা ইহারই মধ্যে ডাঁসিয়া উঠিয়াছে। ছেলের মুখে মজার কথা শুনিয়া বাপের মনে সাজার একটা আতঙ্ক তখন উঁকি দিতেছিল। একদিন বাদে এগারখানা চিঠির মর্য্যাদা যে কিভাবে রক্ষা হইবে এবং রক্ষা করিতে না পারিলে তাহার পরিণাম যে কতখানি অশান্তির সৃষ্টি করিবে, সারাদিনের পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের উপর মুহূর্ত্তেই এই দুশ্চিন্তা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া গেল।

দুই

রজনীবাবু ব্যাঙ্কে কাজ করেন। মাহিয়ানা পান পঁচাত্তর টাকা। কিন্তু আফিসের দেনা ও কয়েকটা কিস্তিবন্দীর মাসিক বরাদ্দ উসুল করিয়া মাস কাবারে বাড়ীতে আনেন বিয়াল্লিশ টাকা আট আনা মাত্র। এই টাকায় বাড়ী ভাড়া, সংসার খরচ, দুধের হিসাব, ছেলে-মেয়েদের স্কুলের খরচ, চা জলখাবার প্রভৃতির ব্যাপার সমস্তই সারিবার কথা। কিন্তু প্রতি মাসেই খরচের দিকের দেনার অঙ্কটা আয়ের অঙ্কের অনুপাতে এতটা দীর্ঘতর হইয়া পড়ে যে, অধিকাংশ দেনাই একেবারে শোধ হইয়া উঠে না, মাসের পর মাস তাহাদের জের টানিয়া রাখিতে হয়। সম্বৎসরের সকল দেনার জের আখিরির এই সঙ্গিন স্থানে দাঁড়াইয়া একযোগে নিকাশের যে রোকা হাঁক্‌ড়াইয়াছে, তাহার মর্য্যাদা না রাখিলে এই বৃহৎ পরিবারটির প্রাণগুলির সহিত মানরক্ষার যে উপায়ান্তর নাই, তাহার হিসাব করিতে হিসাবনবীস রায়মহাশয়ের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।

ব্যাঙ্কে বসিয়া পরের টাকার হিসাব রাখিতে রজনীবাবু যতটা সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বাড়ীতে নিজের উপার্জ্জনের টাকার হিসাব সম্বন্ধে ছিলেন ততটা উদাসীন। এমন একদিন গিয়াছে, ব্যাঙ্কে সারাদিন হিসাবের খাতা ঘাঁটিয়া যে পরিমাণ টাকা তিনি মাসে মাহিনাস্বরূপ উপায় করিতেন, সে টাকা সমস্তই শুধু তাঁহার সংসারে চা-জলখাবারে খরচ হইয়া যাইত।

ব্যাঙ্কের চাকরী বজায় রাখিয়া রজনীবাবু এক ধনী মাড়োয়ারীর সহযোগিতায় পাটের কাজে বেশ দু'পয়সা উপায় করিতেন। তখন তাঁহার বোল্-বোলাও দেখে কে! দোকানদারেরা সে সুসময়ে তাহাদের মাল গছাইবার জন্য রজনীবাবুর বাসায় ধন্না দিয়া পড়িত; হিসাব চুকাইয়া

লইয়া যাইবার জন্য রজনীবাবুই যখন রোকা পাঠাইতেন, টাকা লইতে আসিয়া সবাই তখন বাঁধা বুলি আওড়াইত – আপনার কাছে টাকা পড়ে থাকা, আর ব্যাঙ্কে জমা রাখা একই কথা, আমরা চাই নতুন অর্ডার।

রজনীবাবুর সে দিন চলিয়া গিয়াছে, সুদিনের পড়তার সে চাকা আজ বাঁকাপথে ঘুরিয়া অচল হইয়া পড়িয়াছে। ধনী মাড়োয়ারী লোকসান খাইয়া দেশে পলাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। হঠাৎ যে এমন দুর্দ্দিন আসিবে, তাহা কল্পনা করিবারও অবকাশ তিনি পান নাই। মাড়োয়ারী ফেরার হইলে, ব্যাপারীরা রজনী-বাবুকে ধরিয়া বসে। সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রী-কন্যাকে নিরাভরণা করিয়া, মূল্যবান আসবাব ও তৈজসপত্রাদি বিক্রয় করিয়া দিয়াও তিনি ঋণের দায় এড়াইতে পারেন নাই। ব্যাঙ্কে যে টাকা মাহিনা পান, তাহার উপর টান পড়ে; শেষে কিছু টাকা হাওলাত লইয়া ও কয়েকটা কিস্তিবন্দীর বরাত দিয়া কোন রকমে রেহাই পান।

ব্যবসায়ের পাওনাদারদের হাঙ্গামা মিটিতে না-মিটিতে সাংসারিক সামগ্রী সরবরাহকারী পাওনাদারেরাও সময় বুঝিয়া হিসাব মিটাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দেয়। এখন তাহারা অন্যমূর্ত্তি, তাহাদের ভাষার সুরও অন্যরূপ, যতদূর সম্ভব চড়া। রজনীবাবুর অর্ডারের দিকে আর তাহাদের ব্যগ্রতা নাই, হিসাবের টাকা মিটাইয়া পাইলেই তাহারা যেন বর্ত্তাইয়া যায়। পরিবর্ত্তনশীল সংসারের ইহাই যে চিরন্তনী বিধি; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মাসটি শেষ হইলে রজনীবাবু নিজেই এখন তাহাদের দ্বারস্থ হন। প্রত্যেককে কিছু কিছু দিয়া নতুন ফর্দ্দ দাখিল করেন। বিরক্তভাবেই তাহারা তাঁহার মান রক্ষা করে বটে, কিন্তু মন্দাবাজার ও টাকার টানাটানির দোহাই দিয়া দু'কথা শুনাইতে ইতস্ততঃ করে না। শেষে

লম্বাচওড়া ফর্দ্দ নির্ম্মমভাবে কাটছাঁট করিয়া এমন অনুপাতে মালসরবরাহ করে যে, মাসের শেষের দিকে টানাটানির আর অন্ত থাকে না।

প্রতিমাসেই এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। অথচ ইহার প্রতিবিধানেরও উপায় নাই, মাহিনার কয়টি টাকা ছাড়া আর কোন দিক দিয়া অর্থাগমের কোন সম্ভাবনাও দেখা যায় না, কাজেই মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশটি দিন অভাবের সহিত তুমুল সংঘর্ষ বাধে এবং তাহার ভিতর দিয়াই কোন রকমে দিন কাটে।

সুসময়ে স্বামী যখন দরাজ হাতে বেপরোয়া খরচ করিতেন, গৃহিণী সৌদামিনী দেবী তখন সে সম্বন্ধে টিক্‌টিক্ করিতেন, রজনীবাবুর তাহা ভাল লাগিত না। এখন স্বামীর দৈন্যদশায় তিনি এক এক বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মাত্র, তাহাও গোপনে—ইহাও রজনীবাবুর ভাল লাগে না। গৃহিণীকে বলেন—"সুসময়ে তোমাকে যেমন অবহেলা করেছি, এখন তেমনই তোমার শোধ নেওয়া উচিত; কথায় কথায় আমাকে যদি খোঁচা দাও, তা'হলে আমার মনে কতকটা সান্ত্বনা আসে।"

গৃহিণী হাসিয়া উত্তর দেন,—"তা'হলেই সব দুঃখ আমাদের দূর হয়ে যাবে আর কি! অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে বল ত'? তখন টিক্‌টিক্ করতুম বলে, এখন বরং লজ্জা পাই; খরচ করতে ভালবাস তুমি, দু'হাতে খরচ করে মনের সাধ মিটিয়েছ ত', এইতেই আমার পরম তৃপ্তি!"

রজনীবাবু মনে মনে ভাবেন কত ভাগ্যে সংসারে এমন গৃহিণী আসে! শান্তি যাহার অঞ্চল আশ্রয় করিয়া থাকে, দারিদ্র্য সেখানে ভ্রূকুটি দেখাইয়াও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কি? সংসারে পয়সার চেয়েও বড় রকমের অন্য সুখও আছে।

তবুও সময় সময় অভাবের নিদারুণ তাড়নায় রজনীবাবু ভাঙিয়া

পড়েন, গৃহিণী সৌদামিনী দেবীই তখন অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে খাড়া হইয়া মুহ্যমান স্বামীর ভাঙা মনে জোড়া-তালি দেন।

নতুন খাতার রোকাগুলি স্বামীর মনটি মুসড়াইয়া দিয়াছে, সৌদামিনী দেবী তাহা বুঝিয়া মুখে হাসি টানিয়া কহিলেন—"তুমি না কথায় কথায় বলতে, 'নিশায় পাইলে রক্ষা, বধিব প্রভাতে!'—তবে, আফিস থেকে খেটে-খুটে- এসেই ভাবতে বসেছ কেন শুনি? মানীর মান ভগবান রক্ষা করবেন, মিছি মিছি ভেবে কি লাভ বল ত'?"

পত্নীর কথায় অবসন্ন মনে আবার উৎসাহের প্রবাহ ছোটে। মনে মনে ভাবেন,—সত্যই ত', ভেবে কি লাভ? সারা রাতটা ভেবে কাটিয়ে দিলেও একটা আধলাও ত' মিলবে না, মিছে মাথাটা বিগড়ে যাবে। অত আপদ, বিপদ ও অভাবের ভেতর দিয়েও এতদিন যিনি চালিয়ে এনেছেন, তাঁকে ভুললে চলবে কেন? মান রাখাই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, নির্ম্মম পাওনাদারের চোখের পরদাও তখন আপনা-আপনি ভিজে যাবে।

তিন

প্রত্যূষে রায়মহাশয় পূজায় বসিয়াছেন। ছেলে-মেয়েরা চুপি চুপি দরজার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়ায়, উঁকি দিয়া সন্তর্পণে চলিয়া যায়। কি যেন বলি-বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পায় না। বাপের কড়া হুকুম, পূজার সময় কেহ যেন কোন কথা কহিয়া তাঁহাকে বিরক্ত না করে।

রায়মহাশয় বুঝিলেন, বাহিরের জরুরী তাগিদ আসিয়া ছেলেদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। পূজা সারিয়া উঠিতেই শুনিলেন, "বাহিরের ঘরে অনেকগুলি লোক তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।"

যে সান্ত্বনার সুরটুকু ভাঁজিয়া রাত্রে মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, পূজার ঘরে বসিয়া মা জগদম্বার উপর একান্ত নির্ভরতা জানাইয়াছিলেন, এক নিমিষে তাহা ছায়াবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাহিরের ছোট ঘরখানি প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল। যাঁহারা নতুন খাতার নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, আদায় সম্বন্ধে তাঁহারা কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাই নির্জীব পত্রের উপর সজীব পাত্রও হাজির! কেন না, ঘোর দুর্দ্দিন, আর্থিক সমস্যা একান্ত জটিল, এবার বকেয়া আদায় ছাড়া আর উপায় নাই।

পাওনাদারদের একত্র সংযোগ, বিশেষতঃ দেনাদারের বাটীতে ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে, সেটা যে কতটা প্রীতিদায়ক, তাহা বুঝাইবার নহে। রায়মহাশয়ের সুন্দর মুখখানা মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। ঢোঁক গিলিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—"কি মনে করে আপনারা? চিঠি ত' পেয়েছি, হিসেবও তাতে লেখা আছে—"

'লজ্জানিবারণ-এজেন্সী'র বিল্‌-সরকার ব্যোমকেশ বটব্যাল মুরুব্বীয়ানা-চালে জানাইলেন—"কি করি বলুন, কর্ত্তাদের জোর তাগিদ, চিঠি পাঠিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন কই! দোর্‌-দোর্‌ ছুটোছুটি করে বুঝি প্রাণটাই খোয়াই। কর্ত্তারা বলতে বলে দিয়েছেন, তাঁরা এ যাবতকাল আপনাদের লজ্জা নিবারণ করে এসেছেন, এখন এই অসময়ে আপনারা তাঁদের লজ্জা নিবারণ করুন! যা'হোক হিসেবটা আজই যদি মিটিয়ে দেন, ভারি সুবিধা হয়—"ইত্যাদি।

রায়মহাশয় মনে মনে জগদম্বাকে স্মরণ করেন—তুমি মুখ রাখ মা, আমার তহবিলের খবর তুমি ত' জান মা!—হাসিয়া উত্তর দিলেন—"আমার মনে আছে, বটব্যাল ভায়া, কিন্তু আজ ত' কিছু করবার উপায় নেই, কালই সব ব্যবস্থা করা যাবে।"

প্রত্যেকেরই একই তাগিদ এবং রায়মহাশয়ের উত্তর একই গতে বাঁধা, যেন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে টাকা মজুত হইয়া আছে, কালই তুলিয়া আনিয়া সকলের হিসাব মিটাইয়া দিবেন। রায়মহাশয়ের এই প্রতিশ্রুতির মূল্য যে কতটুকু, তাহা তাঁহার পাওনাদারদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু খোস-খবর ঝুঠা হইলেও তাহা অন্ততঃ শ্রুতি-সুখকর হয়, দেনাদার টাকা দিবার একটা দিন যদি বাতলাইয়া দেয়, পাওনাদার তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং বৎসরের প্রথম দিনটিতে যেন কথার খেলাপ না হয়—এই সতর্ক ইঙ্গিতটুকু করিয়া একে একে তাঁহারা বিপন্ন রায়মহাশয়কে উপস্থিত রেহাই দিয়া গেলেন। তিনি যেন চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছাড়িলেন।

কিন্তু ঘরের কোণটিতে দৃষ্টি পড়িতেই মনটি আবার মুসড়াইয়া গেল! —এখনও যে একজন ঘরখানির মায়া ছাড়িতে পারে নাই, তাহার উঠিবারও গা নাই, বেশ নিশ্চিন্তভাবেই তাকিয়াটির উপর কনুয়ের ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। অথচ, এই লোকটিকে পরিচিত বলিয়া মনে হয় না, সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কোথা থেকে এসেছেন, মশাই?"

মশাই বোধ হয় রায়মহাশয়কে একা পাইয়া কোন কথা কহিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়াই শশব্যস্তে উঠিয়া তাঁহাকে একটা নমস্কার করিয়া কহিল,—"আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু দরকারী কথা আছে।"

রায়মহাশয় তাহাকে বসাইয়া ও নিজে তাহার পাশটিতে বসিয়া কহিলেন—"কি কথা বলুন।"

সে কোন ভূমিকা না তুলিয়াই কথাটা পাড়িল। কহিল—"রামবদন মাড়োয়ারীর সঙ্গে আপনি পাটের কাজ করতেন, আমি তা জানি।

অনেক লোকের অনেক টাকা ডুবিয়ে সে ফেরার হয়েছে। লোকটা ভারি ধড়িবাজ। আপনিও তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। তার জন্য আপনাকেও কম টাকা দণ্ড দিতে হয় নি। আমিও তার কাছে একরাশ টাকা পাব, এই টাকা আদায় করবার জন্য আমাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দু' তরফা মামলা রুজু করতে হয়েছে। এবার আর বাছাধনের নিস্তার নেই। মামলার দিন সামনে, আপনার কাছে এসেছি সাক্ষীর জন্যে।"

রায়মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আমি ত' আপনাকে কোন দিন দেখি নি, রামবদনের সঙ্গে আপনার লেন-দেনের কথা শুনিও নি কোনদিন, জানিও না কিছু; তবে সাক্ষীর জন্যে আমার কাছে আসবার কারণ?"

লোকটি হাসিয়া উত্তর দিল—"কারণ বুঝতে পারছেন না রায়মশাই? —আপনি ছিলেন তার অংশীদার, ব্যাপারীরা আপনাকেই ধ'রে তাদের টাকা উসুল করে নেয়, আপনি অনেক কিছুই জানেন, তাই আপনার সাক্ষীর ওপর আমার ভরসা বেশী।"

রায়মহাশয় ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। চট্ করিয়া এবার জবাব দিলেন—"আপনি মিছে ভরসা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন, আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হবে না, রামবদনের বিরুদ্ধে আমি সাক্ষী দেব না।"

ধড়িবাজ রামবদন মাড়োয়ারীকে যে লোক আইনের বাঁধনে জড়াইতে চায়, সেও বড় ফ্যালনা নয়। সবার আগে এই ঘরটিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়া রায়মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার পাওনাদারদের কথাবার্ত্তায় তাহাদের মনোভাব সে সহজেই বুঝিয়া লইয়াছিল—প্রত্যেক পাওনাদারের নামধাম ও পাওনার হার জানিয়া লইয়া সে এই আসন্ন নতুন খাতায় রায়মহাশয়ের সঙ্গিন অবস্থাটুকু সহজেই অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

সুতরাং এ অবস্থায় যে ঔষধের প্রয়োজন, তাহাই প্রয়োগ করিয়া সে কথাটা পাকা করিতে চাহিল। কহিল—"আহা-হা, আপনি দেখছি রায়মশাই, এতদিন ব্যবসা ক'রে আর ব্যাঙ্কের হিসেব-নিকেশে মাথার চুল পাকালেও উপায়ের দিক দিয়ে নেহাৎ কাঁচা হয়ে আছেন। বয়সে আপনার চেয়ে কাঁচা হলেও, এ সব ব্যাপারে আমরা অনেক আগেই মাথা পাকিয়ে ফেলেছি। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, তা আমরা জানি। আপনাকে অবশ্য কষ্ট একটু দেব কিন্তু তার জন্য এমন কিছু নজরানা দিয়ে যাব, যাতে আপনার এই নতুন খাতার ঝঞ্ঝাটগুলো মিটে যাবে—"

মুখে একটা অর্থ-পূর্ণ হাসি টানিয়া বক্র দৃষ্টিতে রায়মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া সে বেনিয়ানের পকেট হইতে নোটের একটি তাড়া বাহির করিল।

মুহূর্ত্তের জন্য রায়মহাশয়ের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নতুন খাতার সকল চিন্তার অবসান এখনই হইয়া যায়, যদি তিনি—

কথাটা মনেও তুলিতে পারিলেন না, যেন বৈদ্যুতিক শক্তির একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিল। শিহরিয়া উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—"দয়া করে উঠে যান আপনি, টাকার লোভ আমাকে দেখাবেন না। এ কথা খুব সত্য, আমার টানাটানির অন্ত নেই, চারদিকে দেনা ; অন্ততঃ কাল তিনশো টাকার জোগাড় না করলে আমার মান-সম্ভ্রম বজায় থাকবে না, অথচ ঘরে আমার একটি টাকাও মজুত নেই ; সব সত্য, কিন্তু তবুও, আমি রজনী রায়—এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না, আমার সহযোগী বন্ধুকে ফাঁসিয়ে নতুন খাতার মহরৎ আমি করব না, কিছুতেই না।"

কথাগুলো শেষ করিয়াই মাতালের মত টলিতে টলিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

চার

সৌদামিনী দেবী সমস্ত শুনিয়া কহিলেন—"বেশ করেছ; ঠিক করেছ। অভাব থাকলেই অন্যায় করতে হবে, এমন কি কথা! ঘুস খাওয়া, আর মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে পয়সা নেওয়া, একই কথা। এর চেয়ে দেনার দায়ে জেল খাটাও ভাল।"

রায়মহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—"কষ্টের কথা মা জগদম্বাকে নিত্য জানাই, মা শেষে কষ্ট মোচনের এই পথ দেখালেন! টাকা-পয়সাই কি দুনিয়ায় একমাত্র কাম্য!"

সৌদামিনী উত্তর দেন—"ওটা হচ্ছে তাঁর পরীক্ষা। আমাদের ব্যথা হয় ত' তাঁর প্রাণে বেজেছে, তাই যাচাই করে দেখছেন।"

সেদিন ছুটি ছিল। সারাদিন ধরিয়া রায়মহাশয় নানাস্থানে টাকার সন্ধান করিলেন, চড়া সুদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনশো টাকা দূরের কথা, তিনটি টাকাও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পর নিরাশ হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

সৌদামিনী দেবী কহিলেন—"যার তার কাছে ধার চেয়ে নিজেকে আর খাটো ক'র না, তার চেয়ে কাজ কর যেখানে, অন্ন যারা জোটায়, তাদের কাছেই কথাটা পাড়—"

রায়মহাশয় হতাশের সুরে কহিলেন—"আফিসে আর ধার পাবার উপায় নেই, চাইবারও আর মুখ নেই। সাবেক দেনার ওপর গেল বছর যে দেনা করেছি, তাও এখন শোধ হয় নি।"

সৌদামিনী মুখখানি ম্লান করিয়া কহিলেন—"বেচেকিনে দেনা শোধ দেবার মতও ত' ঘরে কিছু দেখছি না।"

রায়মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। মনে পড়িয়া গেল, দেনার দায়ে, স্বামীর মুখরক্ষার জন্য এই সাধ্বী সহধর্ম্মিণী কি না করিয়াছেন! এক একখানি করিয়া গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছেন। সিক্ত চক্ষু দুইটির উপর ভাসিয়া উঠিল—হাতভরা সোনার চুড়ির স্থলে দুই হাতে দুইগাছি মাত্র শাঁখা—নিরাভরণা গৃহিণীর আয়তী রক্ষা করিতেছে।

সৌদামিনী জোর করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"কমলীর কথা শুনেছ? তুমি ফেরবার আগে তার কানের সোনার দুল দুটো দেখিয়ে তোমার নাম ক'রে বলছিল,—কেন তিনি মুখ শুখিয়ে বেড়াচ্ছেন মা, এ দুটো বিক্রী করে দিতে বল, কতকটা দেনা ত শোধ হবে এতে।"

রায়মহাশয়ের দুই চক্ষু ছাপাইয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—সন্ধ্যাহ্নিকের অছিলা করিয়া তখনই তিনি উঠিয়া গেলেন।

পাঁচ

নিজের চেয়ারখানিতে বসিয়া রায়মহাশয় সবেমাত্র বিরাট লেজার-বুকখানি ধরিয়াছেন, এমন সময় গবাক্ষের উপর একখানি মুখ দেখা দিল, "—আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে স্যর!"

রায়মহাশয় লেজার হইতে চোখ দু'টি তুলিয়া কহিলেন—"বলুন।"

"—আমি আসছি 'নিকুঞ্জ থিয়েটার' থেকে; আমাদের প্রোপ্রাইটর গুঁই মশায় আজকের 'ডেটে' একখানা চেক দিয়েছেন তিনশো তিপ্পান্ন টাকার—"

"—তা, আমাকে কি করতে হবে বলুন?"

"—বোধ হয় তাঁর 'একাউণ্টে' টাকা 'সর্ট' আছে—"

"—আচ্ছা, দেখছি।"

মিনিট কয়েক পরেই রায়মহাশয় তাঁহাকে জানাইলেন—'নিকুঞ্জ থিয়েটারে'র প্রোপ্রাইটর মিঃ মধুসূদন গুঁয়ের হিসাবে এখন পর্য্যন্ত মাত্র একশো একাত্তর টাকা তেরো আনা জমা আছে—"

আগন্তুক লোকটি কহিলেন,—"তা হবে। এখন আপনাকে একটু 'ফেভার' করতে হবে স্যর! সব ব্যাঙ্কেই আমাদের যেমন 'একাউন্ট' থাকে, তেমনই সব জায়গাতেই একটা 'প্রাইভেট' ব্যবস্থা ক'রে আমরা অনেক 'অ্যাডভানটেজ' পাই। আপনার কাছেও ঐটুকু চাই আর কি! চেকখানা আপনি দয়া করে আজ ক্যাস করিয়ে দেবেন—সোমবার দশটার সময় আমরা টাকাটা জমা দিয়ে যাব,—শনি-রোববারের সেলের টাকাটা—"

রায়মহাশয় প্রস্তাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন—ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর নিকট এমন প্রস্তাব কেহ তুলিতে পারে, এ ধারণা তাঁহার ছিলনা।—বক্তার বক্তৃতায় বাধা দিয়াই তিনি জবাব দিলেন,—"চেক 'ক্যাস' করাবার ইচ্ছা যদি থাকে, 'ব্যালেন্স' টাকাটা জমা দিয়ে যান—"

"টাকা যদি জমা দেব, তা'হলে আপনাকে ধরেছি কি জন্য স্যর! অবশ্য, আমাদের প্রোপ্রাইটর আপনারও মান রাখবেন বই কি—"

অতি সন্তর্পণে একখানি দশটাকার নোট তিনি রায়মহাশয়ের দিকে চালাইয়া দিয়া কহিলেন,—"আজ সন্ধ্যার পর আমাদের থিয়েটারে আসবেন গুঁইমশাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আপনার ফ্যামিলিদেরও নিয়ে যাবেন আজ, এই সূত্রে আপনার সঙ্গে—"

কিন্তু রায়মহাশয়ের মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গী দেখিয়া বক্তার বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। নোট দুখানা গবাক্ষের বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া রায়মহাশয়

রুক্ষস্বরে কহিলেন—"আমার সামনে থেকে সরে যান, পয়লা বোশেখ আজ একটা কেলেঙ্কারী বাঁধাবেন না।"

লোকটি চলিয়া গেলে, রায়মহাশয় বিস্মিত হইয়া ভাবেন—মা জগদম্বার এ কি খেলা! অভাবগ্রস্ত হয়েছি বলে কি, এইভাবেই আমার অভাব মেটাতে চান?

ছয়

নতুন খাতার শঙ্কটে শঙ্কটত্রাতাদের ফিরিস্তি মনে মনে ঘাঁটিয়া রায়-মহাশয় একজনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি ব্যাঙ্কের এজেণ্ট—কিরণশঙ্কর রায়। লোকটি যেমন অর্থশালী, তেমনই সহৃদয় ও সদাশয়, বিশেষতঃ রায়মহাশয়ের তরফ হইতে এপর্য্যন্ত তিনি অক্ষত অবস্থাতেই আছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে অভিযান করিলে, তাঁহার নতুন খাতার দায় মিটিবার সম্ভাবনা প্রচুর। এখনও ত' দেনা শোধ দিয়া প্রতিমাসে ব্যাঙ্ক হইতে সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকা তাঁহার হাতে আসে। এই টাকার প্রতিভূ রাখিয়া শ'তিনেক টাকা কি ধার মিলিবেনা।

কিন্তু নিজের কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি রায়মহাশয় যখন এজেণ্টের ঘরে ঢুকিলেন, তখন প্রায় তিনটা বাজে, এজেণ্ট কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে তাহার পূর্ব্বেই আফিস হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

আশা রায়মহাশয়ের কানে গুঞ্জন তুলিয়াছে, কাজ এখানে হইবেই, মান বজায় থাকিবেই,—সাধ্বী সৌদামিনী দেবীর কথা কি মিথ্যা হইতে পারে!

'লেক রোডে' এজেণ্টের বাড়ী। রায়মহাশয় আফিসের পাণ্টা

সেইখানে চলিলেন। বাড়ীতে গিয়া ধরিলে হয় ত' আরও সহজে কাজ উদ্ধার হইবে।

কিন্তু বাড়ীতে এজেন্টকে পাওয়া গেলনা। শুনিলেন, আফিসের পর তিনি নিমন্ত্রণরক্ষায় চন্দননগর গিয়াছেন ; ফিরিতে রাত্রি হইবে।

হায় আশা! তোমার মধুর গুঞ্জনও বৃথা হইয়া গেল।

এবার তিনশোর আশা মন হইতে মুছিয়া গেল। 'লেক রোড' হইতে আবার আফিসের দিকে ফিরিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, চেষ্টার ত' ত্রুটি করিলামনা, আমার কি অপরাধ! এখন কোন রকমে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাক। এগারটি টাকা জোগাড় করিয়া প্রত্যেক পাওনাদারকে একটি করিয়া টাকা দিয়া খাতা মহরৎ করা ভিন্ন উপায় কি? তার পর —'নিশায় পাইলে রক্ষা বধিব প্রভাতে!'—সে ভাবনা পরে।

জমাদারের কাছে বারটি টাকা এই সর্ত্তে পাওয়া গেল যে, মাহিনা পাইবামাত্র তাহাকে পনেরটি টাকা দিতে হইবে। আফিসের বাবুদের একান্ত প্রয়োজনে এই হারেই জমাদার তেজারতী চালাইয়া থাকে।

একটি টাকা সংসার খরচের জন্য রাখিয়া, এগারটি টাকা লইয়া রায়-মহাশয় স্পন্দিত-বক্ষে কম্পিত-চরণে নতুন খাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন।

'লজ্জা নিবারণ এজেন্সী'র আসরে হাজির হইতেই চূড়ান্ত খাতির আরম্ভ হইল। স্বয়ং মালিক শশব্যস্তে উঠিয়া রায়মহাশয়ের হাত ধরিয়া ফরাসের মধ্যস্থানে বসাইলেন, স্বহস্তে তাঁহার সম্মুখে আতরদানি তুলিয়া ধরিলেন, মাথার উপর গোলাপ-ঝারির ফোয়ারা ছুটিল।

রায়মহাশয় এত খাতিরেও মনে মনে মুসড়াইয়া পড়িলেন,—কোন্ মুখে এখানে একটি টাকা জমা দিবেন? একবার ভাবেন, এগারো টাকাই জমা দেন, কিন্তু পরক্ষণে অন্যান্যদের মূর্ত্তি মনে করিয়া আবার সঙ্কুচিত হইয়া

পড়েন। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রূপার থালাখানির উপর অতি সঙ্কোচে একটি টাকা রাখিলেন।

ইহা মালিকের দৃষ্টি এড়ায় নাই, তিনি সবিনয়ে কহিলেন—"আবার এ টাকা কেন? হিসেব ত' সমস্তই চুকিয়ে পাঠিয়েছেন। বেশ, যখন দিচ্ছেন, হালসনেই এ টাকাটা জমা থাকুক—"

রায়মহাশয় একেবারে নির্ব্বাক!—তিনি কি শুনিলেন? বলে কি এরা? কার টাকা কার নামে জমা করিয়াছে—উদোর পিণ্ডি নামের ভুলে বুদোর ঘাড়ে চাপায় নাই ত'?

সংশয় মনের মধ্যেই রহিয়া যায়, ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। শেষে প্রচুর আদর আপ্যায়নের ভিতর মিষ্ট-মুখ করিয়া বাহিরে আসেন।

কাছেই 'জীবিকা-নির্ব্বাহ কোম্পানী'র ভাণ্ডার। আজ সেখানে ভাণ্ডারা বসিয়াছে। লুচি-মোণ্ডার মই মাড়ন। এখানেও রায়মহাশয়ের খাতিরের সীমা নাই। 'জীবিকা-নির্ব্বাহ কোম্পানী'র মালিক সত্যস্বর সাধু কর-যোড়ে জানাইলেন—"পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত হিসেব মিটিয়ে দিয়ে ভারী মুখ রেখেছেন রায়মশাই! এই ত' চাই। মুখে যা বলেছেন, কাজেও তাই করেছেন। কাল ফর্দ্দ পাঠিয়ে দেবেন, ফর্দ্দের সমস্ত মাল মুটে দিয়ে পৌঁছে দেব, আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবেনা।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়,—রায়মহাশয় চমৎকৃত! ভূতের মুখে আজ রামের গান! মনে মনে ভাবেন—ব্যাপার কি? এখানেও কি নামের ভুল? উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়াছে?

এখানকার আদর-আপ্যায়ন শেষ করিয়া এবার তিনি ক্ষিপ্র-পদে বাড়ীর দিকে চলিলেন। সংশয় ও আনন্দের দোলায় তাঁহার চিত্ত তখন দোল খাইতেছিল।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া রায়মহাশয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাপার

কি! বাহিরের ছোট ঘরখানি আলোয় কুরকুট্টি—ঘরের ভিতরে ও বাহিরে বড় বড় দুইটি 'পেট্রোম্যাক্স' জ্বলিতেছে। কম্পিতপদে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরখানির ভিতর শাদা ধবধবে জাজিম পাতা, পাঁচ সাতটা মোটা মোটা ঝালদার নতুন তাকিয়া, ফরাসের মধ্যস্থলে লাল খেরোবাঁধা একতাড়া নতুন খাতা, সেগুলি নিবিষ্টমনে গুছাইতেছে—সকালের সেই অপরিচিত মানুষটি, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্ম একটা নোটের তাড়া রায়মহাশয়ের সম্মুখে ধরিয়াছিল।

নির্ব্বাক-বিস্ময়ে রায়মহাশয় তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, তাহার পুরোবর্ত্তী লোকটির উপর রায়মহাশয়ের বিস্মিতদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুটধ্বনি নির্গত হইল—রামবদন মাড়োয়ারী!!

মাথায় পাতলা টুপি, গায়ে আদ্দির ঢিলে পাঞ্জাবী, বিপুল ভুঁড়ীওয়ালা মানুষটি গজেন্দ্রগমনে গজ দুই অগ্রসর হইয়া দুই হাত বাড়াইয়া হাঁকিলেন "আইয়ে বাবুসাহেব, আইয়ে! হামিলোক আপনকার ওপেক্ষা করিয়ে বৈসে আছে। আইসেন, আইসেন,—বৈসেন; বহুৎ বহুৎ বাত আছে আপনকার সাথে।"

ঠিক এই সময় পুত্র সজনী বাড়ীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সোল্লাসে কহিল—"বাবা, দেখবে এস, খাবারে ঘর ভরে গেছে। উমিচাঁদ-বাবুর সঙ্গে আমি এগারটা দোকানই ঘুরে এসেছি; সব দোকানের পাওনা উনি চুকিয়ে দিয়েছেন। উমিচাঁদবাবুকে জান ত? ঐ—উনি! সকালবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, মনে নেই?"

রামবদন মাড়োয়ারী কথাটা সমাপ্ত করিয়া দিলেন—"আরে ও যে হামার ভাতিজা আছে। বিলকুল বাঙ্গালী বনিয়ে গিয়েছে বাবুসাহেব! কালেজে পোড়িয়েছে কি না! তুমি তো বাবুসাহেব হামিলোক কে সুরু

থেকেই হারিয়ে এসেছ, সে সোব হামি শুনিয়েছে। কাল সুবায় তুমিলোককে হারাবার লাগিয়ে এনাকে পাঠিয়ে দিই নোটের একঠো বাণ্ডিল সাথে দিয়ে।—আরে বাপরে বাপ্! তুমিলোক ফিন্ হামি-লোককে হারিয়ে দিয়েছে—সাথ সাথ তাজ্জব করিয়ে দিয়েছে।"

রায়মহাশয় এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—"ব্যাপার কি শেঠজী? যেমন হঠাৎ গায়েব হয়েছিলে, তেমনই হঠাৎ উদয় হ'লে! ছিলে কোথায় এতদিন? এখন কি মতলব বল ত'?"

রামবদন মাড়োয়ারী উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর দিলেন—"যে কাম হামিলোক কোরিয়েছে, তাহার প্রায়স্চিৎ কোরিয়ে যাবেনা? যো মুস্কিলমে তুমিলোক পোড়িয়েছ বাবুসাহেব, হামিলোক তাহার আসান লাগিয়ে আসিয়েছে। হামিলোক রূপেয়া রোজগার কোরতে জানে, রূপেয়ার ব্যেপার বহুৎ বহুৎ কোরতে পারে, লেকেন—আচমকা মুস্কিলে পোড়িয়ে গেলে—টাল সৈতে পারিবেনা—হয় তো—মুলুকমে ভাগিয়ে যাবে, নয় তো—দেওয়ালা মারিয়ে বসিবে। তুমিলোক মুস্কিলের সাথে লড়াই কোরিতে বহুৎ মজবুত আছ। দুর্গাজী হামার মুস্কিল আসান কোরিয়ে দিয়েছে, তিন্ তিনঠো মিলের হোলসেল এজেন্সী হামিলোক বিশ বছরের মেয়াদ কোরিয়ে লিয়েছে! এক বচ্ছরমে লাখো রূপেয়া পয়দা হোয়ে যাবে বাবুসাব! পাটের কামে আজকাল পয়সা মিলবেনা—বিলকুল রোজকার এখন মিলে। হামার লাগিয়ে যেতনা রূপেয়া তুমিলোক খুইয়েছ, হামি-লোক সব শোধ করিয়ে দিবে।"

রায়মহাশয় হাসিয়া কহিলেন—"সব বুঝেছি শেঠজি, সময় বুঝে তুমি আজ পাল্টা জবাব দিতে এসেছ! কিন্তু বুঝতে পারছিনা ত', ঐ সব খাতার গন্ধমাদন এখানে কেন?"

পূর্ব্ববৎ উচ্চহাস্যের সহিত রামবদন মাড়োয়ারী উত্তর দিলেন—

"হামিলোক বুঝিয়ে দিবে,—রামবদন রজনীরায় এণ্ড সন্স' হোলসেল এজেন্সী লিয়েছে ঐ তিনঠো কোটন মিলের! এই বৈঠকে এইবার স্থুরু হোবেক 'রামবদন--রজনী রায় এণ্ড সন্সের নূতন খাতা। যে ভুল কোরিয়েছি বাবুসাহেব আজ রোজ তার বিলকুল মাশুল উস্থল দিয়ে হামি-লোক বহুৎ খুসী আছে।"

প্রকৃতির প্রতিশোধ

চার

এক

সাধু ভাষায় একটা প্রবচন আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী!' অর্থাৎ, যে যেমন কামনা করিয়া চিন্তা করে, সে তেমনই ফল পায়। তবে এই কামনা যদি উচ্চস্তরের না হইয়া নিম্নস্তরেরই এবং তাহার মূলে এমন কোনও গুহ্য তথ্য নিহিত থাকে যাহা প্রকাশযোগ্য নয়, তথাপি একান্ত ও একাগ্র হইলে তাহা সিদ্ধ না হইবে কেন? এই একাগ্রতার প্রভাবে অশীতিপর শ্বশুর যদি অনায়াসে সূঁচের ছিদ্রে সূতা পরাইতে পারেন, প্রগতিবাদিনী তরুণী বধূর পক্ষেই বা তাহার মনের সূঁচে আপাতমধুর কামনার সূতা পরানো কেন অসম্ভব হইবে?

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' সুতরাং শ্বশুরবাড়ী ঘর-বসত করিতে আসিয়াই কলিকাতার মেয়ে ও পল্লী-গ্রামের বধূ লবঙ্গলতার মনে যে ভাবনা জাগিয়াছিল, দীর্ঘ সাত বৎসরের সাধনায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধির কথা শুনিলেই সকলের মনে আনন্দ জাগিয়া উঠে, কিন্তু শুধু মুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ত কোনও লাভ নাই, আমাদিগকে তলে তলে মিশিয়া জানিতে হইবে, চিত্তের এই একাগ্র সাধনায় যে সিদ্ধি সে পাইয়াছে, তাহাতে লবঙ্গ কি সত্যই সুখী হইতে পারিয়াছে?

আপনারা হয়ত জানিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, লবঙ্গ'র ভাবনাটুকু কি! এই তরুণ বয়সেই যে জন্য তাহাকে এতটা একাগ্রভাবে সাধনা করিতে হইয়াছিল!—সেই কথাই বলিতেছি।

দুই

লবঙ্গের যখন বিবাহ হয়, সর্দ্দা-আইন তখনও 'পাস' হয় নাই; তথাপি :লবঙ্গকে প্রথম দেখিতে আসিয়া তাহার ভাবী শ্বশুর মহেশ্বর ঘোষালকে এই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছিল,—"মা-লক্ষ্মীর আর সব ভাল, কিন্তু বয়েসটা ভারী বেখাপ্পা, ছেলের সঙ্গে মানাবে কি না তাই ভাব্‌ছি।"

কন্যাপক্ষ প্রথমেই পাত্র দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন। লবঙ্গ'র দাদা রমেশ রায় বৃদ্ধের সংশয় দূর করিতে ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"নিশ্চয়ই মানাবে, আমি আপনার ছেলেকে মেপে এসেছি যে, প্রায় এক বিঘত তফাৎ; আর বয়েসের কথা যা বল্‌ছেন, আসলে তা নয়, এই সবে পনেরোয় পড়েছে, তবে গড়ন একটু বাড়ন্ত কিনা, আর কলকেতার জল-হাওয়া—"

শেষের কথাটা শুনিয়াই বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয় চটিয়া উঠিলেন, মুখখানা কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"থামুন মশাই, কলকেতার জলহাওয়ার কথা আর তুল্‌বেন না; এসে অবধি আমার ত হাঁফ ধরে গেছে; চার-দিকেই ইটের গরম, গাছের একটা পাতা পর্য্যন্ত নজরে পড়ে না, আকাশ যেন মুখ খিঁচিয়ে আছে, একটু আধটু আলো যা পাচ্ছেন—তাও যেন ওজন ক'রে দেওয়া; এ আবার জায়গা, এর আবার জল-হাওয়া; আওতায় গাছপালাই বাড়ে না, মানুষ বাড়্‌বে?"

রমেশবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন,—"কি করি বলুন ঘোষাল মশাই, জন্মকর্ম্ম এইখানেই; আপনার মত দেদার ফাঁকা জায়গা পাব কোথায় বলুন?"

ঘোষাল মহাশয় এ কথায় কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এ কার্য্য হয়, মা লক্ষ্মী আমার ঘরে যান, একটি বছর পরে দেখবেন তখন এঁর হাল ;—যাকে বলে সত্যিকার বাড়ন্ত।"

রমেশবাবু করযোড়ে কহিলেন,—"তাতে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নেই, আপনার ত সব দেখে এসেছি ; যাকে বলে—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ! এখন এই লক্ষ্মীটিকেও আপনার সংসারে নিতে হচ্ছে, কিছুতেই আমরা ছাড়্ছি না।"

ঘোষাল মহাশয় মুখখানি এবার সহসা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—"দেখুন, আজ যদি আমার গৃহিণী বেঁচে থাক্তেন, এ মেয়ে যতই সুন্দরী হোন্, আর যত কিছু গুণই এঁর থাকুক, আমি নিতে পার্তুম না ; তবে কি জানেন, সংসারটা গুছোবার দরকার হয়েছে, কাজেই ডাগর হলেও আমি সব দিক ভেবে 'না' বল্তে পার্ছি না। আচ্ছা, একটা কথা আমাকে বল্বেন, আপনার ভগিনীটিকে এ বয়েস পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখেছেন কেন ?"

রমেশবাবু একটু কুণ্ঠার সহিত কহিলেন,—"আপনি প্রবীণ ব্যক্তি, বিচক্ষণ, সবই বোঝেন ; প্রথমতঃ পয়সার অভাব, তারপর বাবার মৃত্যুতে কালাশৌচ হয়—"

ঘোষাল মহাশয় পুনরায় জ্বলিয়া উঠিলেন, কথায় বাধা দিয়া বিকৃতমুখে কহিলেন,—"যাক্ মশাই, আর ও বায়নাক্কা তুলে আমাকে রাগাবেন না ; —কালাশৌচের জন্যেই আপনার বোনের বিয়ে আটকে আছে কিনা ! কলকেতার লোক আপনারা—এ সব যে কতটা মানেন, সে আমার জানা আছে। আসলে যা বল্লেন ঐ পয়সার কথা, ঐটিই ঠিক ! পয়সা বা'র কর্বার মুরোদও আপনাদের নেই, আর ছেলে বাছ্বার মত হিম্মতই বা আপনাদের কোথায় ?"

রমেশবাবু কহিলেন,—"যা বলেছেন!"

ঘোষাল মহাশয় উৎসাহের সহিত পুনরায় কহিলেন,—"আপনারা কি চান জানেন? ছেলে হবে আপনাদেরই মত কলকেতার ফিট্‌ফাট্ বাবু, যাকে বলে—বাইরে তার কোঁচার পত্তন আর ভেতরে চলে ছুঁচোর নর্ত্তন! চাল নেই, চুলো নেই, এত বড় দুনিয়া পড়ে রয়েছে—নিজের বল্‌তে এক-টুকরো মাটিও নেই; আফিসে মাস-মাইনের যেমন তেমন একটা চাকরী থাক্‌লেই হ'ল! আপনাদের কাছে সেই হচ্ছে খাসা ছেলে, চড়া দরে তাকেই কেনেন।"

রমেশবাবু এ কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—"আপনি মিছে বলেন নি।"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—"মিছে বলবার মানুষ আমি নই। মুখ দিয়ে যা বার হয়, তা বেদবাক্য জান্‌বেন। আপনাদের এত দুঃখ্যু কেন শুন্‌বেন? আপনারা কলকেতা সহরের ইট কাঁকোরগুলো পর্য্যন্ত কাম্‌ড়ে পড়ে' আছেন—তাই। পাড়াগাঁয়ে ঘেঁষ্‌তে চান্ না, ওর নাম শুন্‌লেই নাক সিঁট্‌কে বল্‌বেন—মশার মুল্লুক, ম্যালেরিয়ার হদ্দো, কাজেই নরক। নিজেরাই যার নামে ভয় পান, সেখানে মেয়ে পাঠাবেন কোন্ ভরসায়; তাই, পাড়াগাঁকে বাদ দিয়ে সহরময় আপনারা ছুটোছুটি করছেন।"

রমেশবাবু স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—"এই ভুলটুকু আমরা বরাবর করে এসেছি বলেই না এবার সেটা শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা করছি—আপনারই দ্বারস্থ হয়েছি ঘোষাল মশাই।"

ঘোষাল মহাশয় পুনরায় উষ্ণ হইয়া কহিলেন,—"তাও হালে পানি না পে'য়ে মশাই! যখন অনেক করে বে'য়ে চে'য়ে দেখলেন—এখানে ভাত-কাপড়ের ভাবনা নেই, ম্যালেরিয়াও ও-তল্লাটে যায় নি, ছেলে দেখ্‌তে

শুন্‌তে ভালই, দু'পয়সা উপায়ও করে, তা' ছাড়া—পয়সা-কড়ি দিতে হবে না ;—অগত্যা রাজী হয়েছেন। কিন্তু সত্যি করে বলুন দেখি, যদি পয়সা আমি চাইতুম, কিম্বা আপনার হাতে বেশী পয়সা থাকৃত, তা' হ'লে পাড়াগাঁয়ে বোনকে পাঠাতেন ? কিছুতেই না, অমনই সহুরে ছেলের জন্যে ঝুঁকৃতেন।"

রমেশবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন,—"না, না, অমন কথা বল্‌বেন না।"

ঘোষাল মহাশয় অকুণ্ঠিতভাবেই কহিলেন,—"দেখুন, পাড়াগেঁয়ে লোক হলেও, আমরা কথার মারপ্যাঁচ জানি না ; যা বলি—তা ঠিকই বলি ; পেটে ক্ষিধে আর মুখে লাজ, আমাদের ধাতে বরদাস্ত হয় না। যা হোক, মা-লক্ষ্মীকে আমার যখন পছন্দ হয়েছে, বয়সের খুঁতটুকু না হয় ছেড়েই দিচ্ছি ; উনিই আমার ঘরে যাবেন। আমার এ-কথার নড়চড় হবে না জান্‌বেন।"

বলা বাহুল্য, ঘোষাল মহাশয়ের এ কথার নড়চড় হয় নাই, লবঙ্গলতা বধূর মর্য্যাদা লইয়া তাঁহার সংসারটি আলো করিতেই গিয়াছিল এবং যতদিন শ্বশুর জীবিত ছিলেন, সংসারে আলোর অভাব দেখা যায় নাই, মধ্যে মধ্যে যদিও নানা সূত্রে অন্ধকারের আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু এই রাসভারী স্পষ্টবাদী মানুষটির ত্রিসীমানা তাহা ঘেঁষিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার পর ?

তিন

প্রথম দর্শনেই বধূ যদিও শ্বশুরের সুনজরে পড়িয়াছিল, কিন্তু শ্বশুর বধূর শ্রদ্ধাটুকু আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। প্রথম দেখার দিনেই শ্বশুরের স্পষ্ট কথাগুলি লবঙ্গের মনে যেন কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। সে ভিতরে আসিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল,—"মাগো, কথা শুন্‌লে গা জ্বালা দেয়, কলকেতা ওঁর কাছে যাচ্ছেতাই,—পাড়াগেঁয়ে ভূত কি না!"

মা কহিলেন,—"চুপ্, চুপ্, অমন কথা বল্‌তে নেই; ওই ঘরইত কর্‌তে হবে মা!"

মুখখানা মচকাইয়া লবঙ্গ কহিল,—"তার চেয়ে হাত পা বেঁধে আমাকে কেন বাবুঘাটে ভাসিয়ে দিয়ে এস না, আপদ্ চুকে যাক্।"

কিন্তু এক মাস পরেই যখন শুভ মিলনের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল ও কিশোরীর সহিত শুভদৃষ্টি হইয়া গেল, তখন আর লবঙ্গের মনে এই সংযোগটুকু আপদ্‌স্থানীয় হইয়া আতঙ্ক তুলে নাই, বরং একটা অননুভূত আনন্দই জাগাইয়া দিয়াছিল।

লবঙ্গ ভাবিয়াছিল, না জানি কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার পাড়াগেঁয়ে জীব ছাঁদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইবে, হয় ত তাহাকে দেখিয়া সে মূর্চ্ছাই যাইবে। কিন্তু শুভদৃষ্টির বিনিময়ে কিশোরীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিপুষ্ট নিটোল দেহ, সুন্দর পুরন্ত মুখখানি ও ভাসাভাসা দুইটী চক্ষু তাহার এ সংশয় মুছিয়া দিল; লবঙ্গকে তখন মনে মনে বলিতে হইয়াছিল, মন্দ নয় ত!

কিন্তু স্বামীর চেহারা সহরবাসিনী এই তরুণীর দৃষ্টিতে মন্দ বোধ না

হইলেও, স্বামীর পল্লী-ভিটা নিতান্ত মন্দই ঠেকিল। কলিকাতা হইতে প্রায় পনেরো মাইল তফাতে অখ্যাত গ্রাম মউমালি ; এই গ্রামেই ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী। মার্টিন কোম্পানীর রেলের ছোট লাইন এই গ্রামখানির প্রান্ত দিয়া এ অঞ্চলের মহকুমায় গিয়া মিশিয়াছে। গ্রামের সীমান্তেই ষ্টেশন, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মহকুমায় যাওয়া যায়। সেখান হইতে কলিকাতায় যাইবার নানা সুযোগ-সুবিধা আছে। এই পথেই লবঙ্গকে শ্বশুরালয়ে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু পল্লীপথের বৈচিত্র্য, রেলের রাস্তার দুইধারে দিগন্তবিসারী শস্যক্ষেত্রের শ্যাম-শোভাময় সৌন্দর্য্য লবঙ্গকে অভিভূত করিতে পারে নাই। কলিকাতা নগরীর চক্ষুচমৎকারী শোভা যতই তাহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইতেছিল, মনের ভিতর ততই যেন একটা হাহাকার গুমরিয়া উঠিতেছিল। ট্রেণের কামরার এক প্রান্তে বসিয়া সে আপন মনেই ভাবিতেছিল—এ যাত্রার শেষ কোথায় ? সত্যই কি তাহার অদৃষ্টে বনবাস লেখা আছে !

মউমালি গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে, প্রায় পাঁচ শত গৃহস্থ এই গ্রামের আশ্রয়ে বসবাস করে। গ্রামে প্রবেশ করিতেই পারিপার্শ্বিক নিদর্শনসূত্রে বুঝিতে পারা যায়, প্রথমেই কুম্ভকার-পল্লীর সংস্থান রহিয়াছে। মাটির ঘটি, বাটি, গেলাস, পুরুয়া, থালা, ভাঁড়, জালা, প্রতিমা প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়াছে ; সন্নিহিত হাটে ও মহকুমার বাজারে এখানকার মৃন্ময় শিল্পের সরবরাহ হয়। এই ব্যবসায়সূত্রে কমলা ইহাদের প্রতি প্রসন্না, অবস্থা ইহাদের স্বচ্ছল। ইহারা বড় একটা চাষ-বাসের তোয়াক্কা রাখে না, গ্রামের চাষীদের নিকট হইতে সম্বৎসরের চাল, ডাল কিনিয়া মজুত করিয়া রাখে, যাহাদের নিজস্ব জমি আছে, বিশ্বাস করিয়া চাষীদের হাতেই ছাড়িয়া দেয় ; চাষীরা সেই জমি আবাদ করিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে নিজের অংশটুকু নিজে লয়, জমির মালিকের জমির বাবদ প্রাপ্য

অংশটুকু তাহার গোলাজাত করিয়া দেয়। এজন্য কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ বাধে না, আদালতেও ছুটাছুটি করিতে হয় না।

এই পল্লীটি পার হইলেই লোহাপেটার শব্দে বুঝিতে পারা যায়, সম্মুখেই কর্ম্মকারদের কর্ম্মশালা। পল্লীর মধ্যে তুইজন মাতব্বর কর্ম্মকারের পাশাপাশি কারখানা পুরুষানুক্রমেই চলিয়া আসিতেছে। ইহাদেরই স্বজাতীয়গণ কারখানায় কার্য্য করে, মজুরী পায়। পল্লীর এই অখ্যাত কর্ম্মশালা তুইটিতেও সহরের বড় বড় প্রতিষ্ঠান অর্ডার পাঠায়; নামজাদা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক শপের তুলনায় এখানকার এই নিরক্ষর কামারদের মস্তিষ্কের পরিকল্পনায় প্রস্তুত বড় বড় জরুরী কাজ অতি সুলভে দেশীয় প্রথায় সম্পন্ন হইয়া উচ্চ সার্টিফিকেট পায়।

ইহার পরেই পল্লীপ্রাণ চাষীদের পণ্যশালা;—শ্রেণীবদ্ধ পর্ণকুটীর, খেত-খামার—বিবিধ পণ্য উৎপাদনের কত প্রকার ব্যবস্থা। যাহারা আখের চাষ করিয়াছে, তাহা মাড়াইবার, রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈয়ারী করিবার পরিচিত আয়োজন,—সুগন্ধে পল্লী আমোদিত। পল্লীর বালক-বালিকারা কচি কচি কলাপাতার ঠোঙ্গা বাঁধিয়া বাণশালগুলির আঙ্গিনায় ঘুরিতেছে; কেহ চায় কাঁচারস, কেহ তাতারসের প্রার্থী, কেহ চাহিতেছে গরম গুড়। বালকবালিকা—ভগবান ভগবতীর অংশ, ইহাই হৃদয়বান্ কৃষকদের বিশ্বাস, ইহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করাই সৌভাগ্য, সুতরাং রিক্ত হস্তে কাহাকেও ফিরিতে হয় না। সারিবদ্ধভাবে বসিয়া পাতা-নির্ম্মিত আধারে সকলেই চুমুক দিতেছে, দেখিলে মনে হয়, আনন্দ ও উৎসাহ যেন আঙ্গিনাময় ছুটাছুটি করিতেছে।

এমনই এক একটির পর এক একটি পাড়ার সন্নিবেশ; ইহাতে বুঝা যায়, অতীত যুগে কি উদার পরিকল্পনায় এই গ্রামখানির রচনা ও এমন সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বসবাসের সূচনা হইয়াছিল! গ্রামের মধ্যে সকল

জাতিরই অস্তিত্ব রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক জাতিই যেন গ্রামের এক একটি বড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। নদীর দিকে ব্রাহ্মণপাড়া, তাহার এক পার্শ্বে কায়স্থ, অন্য পার্শ্বে কৈবর্ত্ত ও সদ্‌গোপদের বাসভূমি। গ্রামের একাংশে নমঃশূদ্র, বাগ্দী, মুচি প্রভৃতিরও সমাবেশ আছে। হিন্দুপল্লীর পরেই একটি খাল নদী হইতে বাহির হইয়াছে; এই খালের অপর পারে চর-মউমালি গ্রাম; এই গ্রামের যাহারা অধিবাসী, তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমান।

গ্রামে নদী আছে, দেবালয় আছে, চর-মউমালি গ্রামে মস্‌জিদও আছে। কিন্তু কৃষি অধিকাংশের উপজীবিকা বলিয়াই হউক বা একই মাটির উৎপন্ন ফসল অবাধে সকল জাতির গোলাজাত হয় ইহা দেখিয়াই হউক, জাতি বা সম্প্রদায়গত অসদ্ভাব গ্রামের শান্তিকে এপর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের সমস্যা এ গ্রামে কোনও দিন কোনও সংশয় উপস্থিত করে নাই এবং তাহা সমাধানের জন্য কোনও সভাও বসাইতে হয় নাই। এমন কি, অন্য প্রদেশের মুচি, মেথর ও নমঃশূদ্রেরা মন্দিরে ঢুকিবার জন্য লাঠালাঠি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে শুনিয়া, এই গ্রামের এই জাতীয় অন্ত্যজরা অবাক হইয়া গিয়াছে, এমন কাণ্ড যে তাহাদের জাত-ভাইরা বাধাইতে পারে, আর ইহাতে তাহাদের কি লাভ, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। আবার, এই গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান চাষীরা খালের ধারের ময়দানে জমির পরিচর্য্যা করিতে করিতে বলে,—মোদের লড়াই এহানে, কার ক্ষেতে কে কত বেশী আর জল্‌দী ফসল ফলাতি পারে।

মসজিদের নিকট বাজনা বাজিলে নামাজ বন্ধ হয়, আর সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই বাধে,—ইহাতে এই অঞ্চলের কৃষিজীবিদের বিস্ময়ের অবধি নাই। বাহিরের ঝগড়ার কথা শুনিলে ইহারা হাসিমুখে পরস্পর বলাবলি করে,—ওরা সব সহরে ঘরবসত করে, তাই ঝুটো নিয়ে হককে খাটো করে;

আরে ভাই, মোদের আবার জাত কি? মোরা হিঁদুও নই, মুসলমানও নই, মোরা হচ্ছি—চাষী; ক্ষেত-ভুঁই মোদের জাত-ধম্ম্য সবই!

একই মাটিতে দাঁড়াইয়া এমন নীতিকে যাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে, কলহ-কিচকিচি অশান্তির হাত ধরিয়া সেখান হইতে পলাইবার পথ পায় না।

প্রতিবেশীদের মধ্যেও কেমন একটা প্রীতি-মধুর সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কাহরও মাথার টিকি ধরিয়া কথা কহে না, প্রত্যেকেই এক একটা সম্পর্ক বাছিয়া লইয়াছে; এখানে জাতি, বর্ণ বা গোত্রের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, পরস্পরের প্রতি প্রীতিই এখানে সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ ঠাকুরদা, কেহ কাকা, কেহ খুড়ো, কেহ মেশো,—মহিলামহলেও এমনি মা, দিদি, মাসী, ঠাকুমা, দিদিমা, খুড়িমা প্রভৃতি এক একটা সম্পর্ক বেশ হিসাব করিয়াই পাতান হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও বয়োবৃদ্ধদের সংস্পর্শে আসিলে জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া বয়ঃক্রমগত উৎকর্ষ অনুসারে শ্রদ্ধাসহকারেই যথাযথ সম্বোধন করিয়া থাকে। এবং সার্ব্বজনীন সম্পর্কনিষ্ঠা যদিও কৃত্রিম ও বাহ্যিক, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ এমনই নিবিড় হইয়া উঠে যে, পরস্পরের সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, উৎসবে-ব্যসনে সত্যকার দরদ পাতানো-সম্পর্কের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

হয় ত, পল্লীসুলভ এই সকল প্রথা—সার্ব্বজনীন মিলনের এই সহজসুন্দর ব্যবস্থা, সহরবাসী সত্যকার দরদীর মনে শ্রদ্ধা-পুলকের সঞ্চার করিবে। কিন্তু লবঙ্গলতার তরুণ চিত্তে ইহাতে পুলকপ্রবাহ বহিবার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না, বরং বিষের বাষ্প উঠিয়া একটা কদর্য্যভাবের সৃষ্টি করিল। পল্লী-অঞ্চলের শোভা ও সৌন্দর্য্য যাহার চক্ষুকে চমৎকৃত করিতে পারে নাই, শ্বশুরের আড়ম্বরহীন পল্লী-ভবনও তাহাকে কিছুমাত্র আনন্দ দেয় নাই। বড়

বড় ঘর হইলে কি হয়, তাহাদের দেওয়ালগুলি ত ইটের নহে—মাটির ; ছাদেও কড়ি নাই, বরগা নাই কিম্বা সিমেণ্ট জমাইয়া ঘরের মাথাগুলি জমানো নহে,—বাঁশ-বাঁকারীর সাহায্যে পুরু করিয়া উলু দিয়া ছাউনী,—এ ধরণের পর্ণশালার কথা সে নভেলে পড়িয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতেছে—এই প্রথম ! ঘরের কোলে লম্বা-চওড়া দরাজ উঠান না হয় আছে, কিন্তু তাহাও মাটির, কলিকাতার মত বাঁধানো নয়, পা দিলেই ধূলো লাগে ; আবার প্রত্যহ প্রভাতে এই প্রকাণ্ড উঠানটির আগাগোড়া জল ও গোময় দিয়া নিকানো হয়। শ্বশুর বলিয়াছেন,—তাহাকেই এ-কার্য্য করিতে হইবে, যেহেতু স্বাস্থ্য ইহাতে ভাল থাকে !

বাড়ীতে গোলাভরা ধান, তাহা পাড়িয়া বাছিয়া পাট করিয়া ঢেঁকিতে ভানিয়া চাল তৈয়ারী হয়। শ্বশুর জানাইয়াছেন,—ধান-চালের পাট আগেই শিখিয়া লওয়া চাই ; যেহেতু, ইহাই কুলবধূর কৌলিক কাজ ?

পল্লীর বধূ ও কন্যারা লবঙ্গের সহিত ভাব করিতে আসিল, কত ভাবের কত কথাই তাহারা মন খুলিয়া কহিল, কত কথাই লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু লবঙ্গ নীরব। সে সহরের ইস্কুলে পড়িয়াছে, বড় বড় ঘরের বিদূষী মেয়েদের সহিত মিশিয়াছে, থিয়েটার দেখিয়াছে, টকি-সিনেমায় গিয়াছে, রুচি তাহার কত উন্নত ! কিন্তু ইহারা ? মাগো ! যাহাকে বলে পাড়া-গেঁয়ে জানোয়ার ; গায়ে পড়িয়া কথা বলে ; অথচ, বলিবার কায়দাও জানে না।—ইহাদের সহিত তাহাকেও মিশিতে হইবে ?

লবঙ্গ অষ্টাহ শ্বশুরালয়ে থাকিয়া সব দেখিল, শুনিল ; শ্বশুরের কি ইচ্ছা তাহাও বুঝিল। কিন্তু মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিল, এখানে সে থাকিতে পারিবে না, পাড়াগাঁয়ের কদর্য্যতা ও নানাবিধ অসুবিধা তাহার সহ্য হইবে না।—বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষুব্ধ চিত্তের এই সাধনাই তাহার একাগ্র হইয়া উঠিল।

চার

কলিকাতায় ফিরিলে লবঙ্গের মুখে শ্বশুরবাড়ীর নিন্দা আর ধরে না। অথচ তাহার দাদা দুইজন বন্ধুর সহিত প্রথম দিন পাত্র দেখিয়া আসিয়া কি সুখ্যাতিই না করিয়াছিলেন! যাহাদের ভাত-কাপড়ের ভাবনা নাই, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, হঠাৎ বাড়ীতে দশজন অতিথি-কুটুম্ব আসিলে অকাতরে তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা সুখী কে? লবঙ্গ আসিয়া দাদার পছন্দের উপর টিট্‌কিরি দিয়া বলিল;—"আহা! কি চোখেই দাদা আমার মউমালি দেখে এসেছিলেন? উনি দু'-দণ্ড ছিলেন, তাই ভাল লেগেছিল ওঁর, কিন্তু দুটো দিন যদি থাকৃতেন সেখানে, বুঝতেন কি রকম সোণার দেশ! আমার ত বিয়ে দেন নি দাদা, বনবাসে পাঠিয়েছেন!"

লবঙ্গের বাবা নিতাইবাবু শিয়ালদহ কোর্টে ওকালতী করিতেন, ছাঁ-পোষা মানুষ, যাহা উপায় হইত, সংসারের সকল অভাব তাহাতে মিটিত না। কাযেই সারা জীবন পরের বাড়ী ভাড়া করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন, এবং শিয়ালদহ কোর্টকে কেন্দ্র করিয়া ইটালী হইতে পটলডাঙ্গার চতুঃসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলে বছর বছর বিভিন্ন বাড়ীতে বাসা পাতিয়াছেন। সহরে একই বাড়ীতে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভাড়াটিয়ারা যে দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না, যাঁহারা ভাড়া-বাড়ীতে বাস করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা ভালোভাবেই একথা বুঝেন।

নিতাই বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল, ছেলে ও মেয়েগুলিকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, অর্থের অস্বচ্ছলতায় অনেক সময় তাহা কার্য্যকরী হয় না; নিতাই বাবুরও হয় নাই। একমাত্র পুত্র রমেশ

কোনও প্রকারে আই, এ, পাস করিয়াই চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়ে। উপরের তিনটি মেয়ে ইস্কুলের সামান্য শিক্ষা পাইলেও গৃহস্থালীর শিক্ষা ভাল রকমই পাইয়াছিল। লবঙ্গই ছিল নিতাই বাবুর আদরের মেয়ে, সুতরাং উচ্চ শিক্ষা দিবার অভিলাষটুকু তিনি ইহার উপর দিয়াই চালাইতে প্রয়াস পান। কিন্তু পাঁচটি বৎসর ধরিয়া ইস্কুলের মোটরভাড়া, মাহিনা ও মায়ের ফরমাসমত নানা ফ্যাসানের শাড়ী, ব্লাউস ও স্যাণ্ডেল যোগাইয়া অবশেষে ইহাই তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, শিক্ষার দিক্ দিয়া মেয়ের উচ্চ হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, বরং প্রগতির পথে মেয়ের মনোবৃত্তি এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নাগাল পাওয়াই কঠিন। অতঃপর কন্যার সম্বন্ধে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত, ইহাই যখন নিতাই বাবুর প্রধান চিন্তা হইয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়ে পরলোকের আহ্বান ইহলোকের এই চিন্তাটুকুও তাঁহার অবশ করিয়া দিল।

পিতার মৃত্যুর পর রমেশ বাবু ভগিনীর সম্বন্ধে রীতিমত কঠিন হইয়াই উঠিলেন। লবঙ্গের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ইস্কুল ছাড়াইয়া দিলেন, থিয়েটার সিনেমায় যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শিখিতে বাধ্য করা হইল। পিতা কিছু সঞ্চয় করিয়া যান নাই, তিনটি কন্যাকে পার করিয়া তিনি এক রকম রিক্তই হইয়াছিলেন। নিজেরও উপার্জ্জন পর্য্যাপ্ত নহে, অথচ লবঙ্গকে পাত্রস্থ করা এখন তাঁহারই দায়। এ অবস্থায় অনেক দেখা-শুনার পর পল্লী-অঞ্চলের এই সম্বন্ধই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া তুলে এবং ভগিনীর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই তিনি এমন এক অভাবহীন সংসারে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন—এক মুষ্টি অন্নের জন্য যেখানে কোনও দিন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িবে না।

কিন্তু সহরের আপাতমধুর সুখ-সুবিধার মোহ লবঙ্গের মনে এমনই ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল যে, শ্বশুর ও স্বামীর ভিটার স্মৃতি তাহার মধ্যে

পড়িয়া বনবাসের অনুভূতিই সৃষ্টি করিল। অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুর বধূকে লইতে আসিলেন, এ পক্ষকে বুঝাইয়া কহিলেন,—আমি থাক্‌তে থাক্‌তে বউমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাই, লেখাপড়ার শিক্ষা ওঁর হয়ত যথেষ্ট থাক্‌তে পারে, কিন্তু সংসার চালাতে যে শিক্ষার দরকার, তাতে এখনো ওঁর হাতেখড়ি হয় নি ; কাযেই এখানে ওঁকে ফেলে রাখা যেমন চল্‌বে না, ঘন ঘন আস্‌বারও ছুটি তেম্‌নি পাবেন না।

শ্বশুরের কথাগুলি লবঙ্গের মনে বিষম জ্বালা ধরাইয়া দিল। মায়ের পায়ের তলায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া সরোদনে কহিল,—"দাদা আমার সঙ্গে কি শত্রুতাই সেধেছেন মা ! কিন্তু আমি ওখানে কিছুতেই যাব না—"

মা কহিলেন,—"ষাট্‌, ষাট্‌,—জন্ম জন্ম ঐ ঘরই কর, এই আশীর্ব্বাদ আমি করি—"

মায়ের মুখের কথায় বাধা দিয়া অস্বাভাবিক সুরে লবঙ্গ কহিল,— "তোমার আশীর্ব্বাদ ঘুরিয়ে নাও মা, ঘুরিয়ে নাও ; বল,—ও ঘর যেন আমাকে করতে না হয়।"

মেয়ের কথায় মায়ের মুখখানা ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ইষ্টদেবীকে ডাকিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, মেয়ের যেন সুমতি হয়। পরক্ষণে মুখখানি কঠিন করিয়া অনুযোগের সুরে কহিলেন,—"তোর মুখ বড় আল্‌গা হয়েছে লবি, লেখাপড়া শিখেছিস্‌, কিন্তু গুছিয়ে কথা বল্‌তে শিখিস্‌ নি, এ ত ভাল নয়।"

লবঙ্গ কথার কোনও উত্তর না দিয়া মুখখানা ভার করিয়া উঠিয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া মাকে ধরিয়া বলিল,—"তুমি আমাকে পাঠিয়ো না মা, আমি যাব না ; সেখানে কিছুতেই আমার মন বসবে না।"

মা কহিলেন,—"মেয়েমানুষের মন, যে দিকে নিবিষ্ট করবে, সেইখানেই বস্‌বে। সুখ আর কোথাও নেই মা, শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ঘর—সেইখানেই সুখ, সেই তোমার সব তীর্থ। তবে নিজে ইচ্ছে করেই যদি মনকে বিগড়ে দাও সে কথা আলাদা।"

কিন্তু মায়ের এ সব কথা মেয়ের মনে বসিল না, সে অনেক কাঁদিল মাথা খুঁড়িল, কিন্তু মায়ের মন টলিল না, ভাই ও ভ্রাতৃজায়া কঠিন হইয়া দু' কথা শুনাইয়া দিলেন, লবঙ্গর এই অনুচিত আব্দার তাঁহাদের অসহ্য হইয়াছিল। বহু দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেখাইলেন, সহরের কত মেয়ে সুদূর পল্লী-অঞ্চলে পরিণীতা হইয়া কিরূপ সুখী হইয়াছে। মা উপদেশের ছলে কহিলেন,—এখন থেকে মন বেঁধে ফেল মা, মেয়েমানুষের মন, নিজের ঘর-সংসারে যাতে বসে, তাই কর্‌তে হবে। তখন দেখ্‌বে কত সুখ সেখানে পড়ে আছে, সহরের যে সব দেখে নেচে ওঠ, সে ত আতসবাজী; শুধু চোখে দেখ্‌তেই ভাল, কিন্তু এর সঙ্গে নিজের ঘর-সংসারের কি সম্বন্ধ আছে বল!

অগত্যা লবঙ্গকে শ্বশুরের সহিত যাইতেই হইল, এবং সে সঙ্গে লইয়া চলিল একটা অপরিসীম অসন্তোষ, যাহা তাহার মনের মধ্যেই ধীরে ধীরে বহ্নির মতই ধূমায়িত হইতেছিল।

পাঁচ

সংসারের দুই শ্রেণীর অবুঝ মেয়ে দেখা যায়। একের স্বভাব, নিজে যেটি ভাল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে, কেহ তাহাকে স্বীকার করাইতে পারিবে না যে সেটি খারাপ। এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা উঠিলেই ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, প্রতিবাদ তুলে, তর্ক বাধায়, ঝগড়া করিতেও

পেছপাও হয় না, লাঞ্ছনা অপমানও মাথা পাতিয়া লইতে দ্বিধা করে না ; কিন্তু তথাপি নিজের মতটি বদলায় না, বা, সে-যে ভুলের পথে ছুটিয়াছে—কেহ তাহাকে কথাটা বুঝাইতে পারে না। আর, অপর শ্রেণীর অবুঝ মেয়ের স্বভাব, মনের ভিতরে যেটি ঠিক দিয়া রাখে, তাহাই অভ্রান্ত স্থির করিয়া নীরবেই সেইটি ধরিয়া থাকে। ইহারা কথায় কথায় তর্ক তুলে না, প্রতিবাদ করে না, ঝগড়া বাধায় না, বিরুদ্ধবাদীদের কথা নিরুত্তরেই শুনিয়া যায়, হয় ত ক্ষেত্র বুঝিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায়ও দেয়, কিন্তু মনে মনে গুমরাইতে থাকে। এই প্রকৃতির মেয়ে আমাদের লবঙ্গলতা।

সাতটি বৎসর ধরিয়া ঝুনো শ্বশুর তাহাকে পাখী-পড়ানোর মত কাছে বসাইয়া সংসার-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কত শিক্ষা দিয়াছেন, যাহাতে বধূ এ-সংসারে আদর্শ গৃহিণী হইতে পারে, সে দিক্ দিয়া কত প্রয়াসই পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা কি সফল এবং সার্থক হইয়াছে ?

বধূ নীরবে শ্বশুরের প্রতি কথাটিই শুনিয়াছে, কিন্তু কথার পিঠে কোনও দিন একটি প্রশ্নও সে তুলে নাই অথবা তাহার মুখ ও চক্ষুর উপর কোনও ভাবের কোনও চিহ্ন ফুটিয়া উঠে নাই। সংসারের কাজ, সেবাধর্ম্ম, পল্লীসুলভ নানাবিধ ব্যঞ্জন পাকের প্রণালী, সাধারণ কৃষিকাহিনী, ঠাকুরঘরের গোছগাছ, বিগ্রহের সেবাপরিচর্য্যা—যেগুলি পল্লীবধূদের জ্ঞাতব্য বিষয়, বৃদ্ধের একান্ত ইচ্ছা, বধূ হাতে-কলমে এই সকল শিখিয়া লয়, এজন্য তিনি কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কত সময়ই ইহাতে দিয়াছেন। কিন্তু বধূ কি আন্তরিক আগ্রহে ইহা শিখিত? শ্বশুরের এই সকল শিক্ষায় সে কি নিষ্ঠার সহিত যোগদান করিত ?

বধূর সম্বন্ধে শ্বশুর কহিতেন,—"এ বয়সে অনেক মানুষই দেখ্‌লুম, আর যাদের দেখেছিলুম্, ভাল করে চিন্‌তেও পেরেছিলুম। কিন্তু সাত বৎসর এক বাড়ীতে থেকেও আমার বউমা'টিকে চিন্‌তে পার্‌লুম্ না।"

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিত,—সে কি! আপনি মানুষ দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারেন, আর নিজের বউমাকে চেনেন নি! কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তিনি ত ভালই—

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিতেন,—"আমিও কি তাঁকে মন্দ বলেছি? বউমা ত আমার ভালই; যা বলি, তাই করেন; যা যা করা দরকার, কলের মতই সে সমস্তই সারেন; কিন্তু কি জানি, ওঁকে দেখ্‌লেই আমার মনে হয়, যেন একটি কলের পুতুল, কে যেন দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, উনি তারই জোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, করছেন সবই, কিন্তু তাতে যেন প্রাণ নেই। উনি যেন পণ করে বসেছেন, অন্যের সবই শুন্‌বেন, কিন্তু নিজের তরফ থেকে কিছু বল্‌বেন না; এও ত ঠিক নয়!"

স্বামীও এই সাত বৎসরে বধূকে চিনিতে পারে নাই। কিশোরী মার্টিন কোম্পানীর আফিসে চাকুরী করিত। আটটার সময় খাইয়া ট্রেন ধরিতে ছুটিত, ওদিকেও ফিরিত রাত্রি আটটায়। সারাদিন বাহিরে কাটাইয়া রাত্রে যখন স্ত্রীর সহিত মিলন হইত, কোনও কথাই জমিত না। এখানেও বধূর কথায় উৎসাহের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যাইত না, কোনও বিষয়েই কিছুমাত্র আগ্রহ বা কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইত না; বধূ সদাসর্ব্বদাই মুখখানি মলিন করিয়া থাকিত, হাসি তাহাতে বড় একটা ফুটিত না, যখন তাহাতে হাসির রেখাটুকু পড়িত, তাহা এত ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী যে, মনে উল্লাসের পরিবর্ত্তে বিরক্তিই সৃষ্টি করিত।

কিশোরী প্রায়ই প্রশ্ন করিত,—"তুমি এ রকম হয়ে থাক কেন? তোমার কি দুঃখ বল্‌বে?"

বধূ ম্লান-মুখে ক্ষীণস্বরে উত্তর দিত,—"কি আর দুঃখ আমার!" —সঙ্গে সঙ্গেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস শ্বসিয়া উঠিত।

কিশোরী বিরক্তভাবে কহিত,—"কিছুতেই ত তোমার মন পাওয়া

গেল না; কোন কষ্ট নেই, কিছুমাত্র অভাব নেই, বাবার এত আদর, আমিও কোনও দিন তোমাকে তুমি ছাড়া তুই বলি নি, কিন্তু তবুও তোমার মুখে হাসি নেই, যখনই দেখি—মুখখানা ভার করেই আছ। কি তোমার কষ্ট, বল্‌তে ত পার?"

বধূ পূর্ব্ববৎ ক্ষীণকণ্ঠেই জানাইত,—"আমি ত কোন নালিশ করি নি। তবে হাসি না কেন? আমার ভাল লাগে না, তাই।"

ইহার উপর আর-কি কথা উঠিতে পারে! কিশোরীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়, মনে মনে সে ভাবিতে থাকে, সুন্দরী-শিক্ষিতা স্ত্রী পাইয়াও সে কি সুখের আস্বাদ পাইয়াছে? সহধর্ম্মিণী যদি সহযোগিতা না করে, হাসি-মুখে সদাসর্ব্বদাই কথা না কহে, স্বামীর পক্ষে ইহা কি মর্ম্মান্তিক নহে!

অথচ এ সংসারে কোনও অভাব নাই, সুশীলা বধূর যাহা যাহা কাম্য তাহার সবই এখানে আছে। শাশুড়ীর অভাব শ্বশুরই পূরণ করিয়াছেন; সকল পাল-পার্ব্বণে বধূকে ডাকিয়া তিনি প্রশ্ন করেন,—"বউমা, তুমি কোন ব্রত নেবে?"

বিরস-বদনে ঘাড়টি নাড়িয়া বধূ জানায়,—না।

শ্বশুরের বুকের ভিতর অতীতের কত স্মৃতিই তোলপাড় করিতে থাকে। তাঁহার স্বর্গীয়া গৃহিণী কত বার-ব্রত করিতেন, এমন কোনও ব্রত নাই—যাহা তিনি উদযাপন না করিয়া গিয়াছেন। অথচ, তাঁহার বধূর এ সম্বন্ধে কোনও উৎসাহই নাই! পাড়ার আর দশজন মেয়েও ত ব্রত-কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের দেখিয়াও কি বধূর মনে কোনও ব্রত লইবার সাধ জাগে না?

প্রতি বৎসর নববর্ষের প্রথম দিনটিতে এ বাড়ীতে ঘটা করিয়া গৃহ-দেবতার পূজা হইত। এই উপলক্ষে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে জলপূর্ণ কলসী উৎসর্গ করিয়া ভোজ্যাদি সহ গৃহে গৃহে বিতরণের ব্যবস্থা থাকিত। এই

দিনের আয়োজন পল্লীর সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিত। মউমালির আবালবৃদ্ধবনিতা ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে শুভ পয়লা বৈশাখের মহোৎসবের সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিত। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, আহূত, অনাহূত, সকলেই এই শুভদিনে ঘোষাল-ভবনে ভূরিভোজে তৃপ্ত হইয়া —অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্ত্তন শুনিয়া সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলিত!

ইদানীং শ্বশুর শুধু এই দিন জোর করিয়া বধূকে দিয়া কোনও ব্রত লওয়াইতেন বা তাঁহারই একান্ত প্ররোচনায় বধূ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-গৃহীত ব্রত ঘটা করিয়া এই দিন উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করিতেন, বধূর আত্মীয়-স্বজনেরাও এই পর্ব্বোপলক্ষে সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন। কিন্তু সকলেই স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখিতেন,—কলের পুতুলটির মতই এই বাড়ীর বধূ তাহার কর্ত্তব্যটুকুই করিয়া চলিয়াছে, এই সার্ব্বজনীন আনন্দেও তাহার মুখখানি ম্লান, তাহাতে হাসির চিহ্নও নাই; চক্ষু দুইটি ছলছল, উৎসাহের অভাবে প্রভাহীন।

লবঙ্গলতার বিবাহের সাত বৎসর পরে নববর্ষোৎসবের শুভদিনটিতে একদা তাহার এই ম্লানমুখ, ছলছল চক্ষু, নিরুৎসাহ প্রকৃতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি শ্বশুরের চিত্তে সহসা কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা তুলিয়া দিল, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া তিনি দৃপ্তস্বরে কহিলেন,—"আমি অন্ধ নই বউমা, তুমি শুধু আমাকে অবহেলা করনি, তোমার বিবেককে, তোমার নারীত্বকে তুমি অবহেলা করেছ; আমি সহ্য করলেও কমলা সহ্য করবেন না; এর প্রতিফল একদিন তোমাকে পেতেই হবে বাছা।"

ছয়

যে বৎসরের প্রথম দিনটিতে বর্ষীয়ান্ শ্বশুর মহেশ্বর ঘোষাল মহাশয়ের মুখ দিয়া এই নির্ঘাত কথা কয়টি নির্গত হইয়াছিল, সেই বৎসরেই উপর হইতে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার উপর মহাকালের তলব আসিয়াছিল যে, মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে পুত্রবধূকে মার্জ্জনা ও সেই সূত্রে আশীর্ব্বাদটুকু করিবার ফুরসৎটিও তিনি পান নাই।

মউমালি ও তাহার অন্তঃপাতী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা আর্ত্তস্বরে উচ্ছ্বাস তুলিয়াছিল—একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। ঘোষাল মহাশয়ের শোকে সকলেই অভিভূত। কিন্তু বধূ লবঙ্গলতার দেহটি যে শ্বশুরের বিয়োগে শোকমথিত হইয়াছে, এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। এ অবস্থায়ও তাহার নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া এইটুকুই অনুমান করিতে পারা যাইত যে, অদ্ভুত প্রকৃতির এই মেয়েটীর বুঝি ডিক্রীতেও যেমন উল্লাস নাই, ডিস্‌মিসেও তেমনই হুতাশ নাই!

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিদায় লইলে কিশোরী একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়িল। পিতার অভাবে শোকের ব্যথা কিছুতেই সে ভুলিতে পারিতেছিল না; গৃহে যিনি সর্ব্বময়ী, তিনি ত নিষ্প্রাণ, কোনও বিষয়েই তাঁহার সাহচর্য্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। আফিস হইতে সে ছুটি লইয়াছিল, একটি মাসের ছুটি দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। আফিসে যোগদানের পূর্ব্বেই সে এক আদেশ-পত্র পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। আফিসের কর্ত্তারা তাহাকে জানাইছেন—অতঃপর তাহাকে মহকুমার আফিস হইতে কলিকাতার হেড আফিসে বদলী করা হইল; ছুটি ফুরাইলে, সেইখানে গিয়াই কার্য্যভার লইতে হইবে।

বদলীর এই সংবাদটি পাইয়াই কিশোরী বুঝিল, মহাগুরু নিপাতের বৎসরটি তাহার পক্ষে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে, ইহা ত তাহারই সূচনা। কেন না, চাকরীটি বজায় রাখিতে হইলে বাড়ী হইতে কলিকাতায় আফিস করা চলিবে না, বাসায় বা মেসে গিয়া আস্তানা পাতিতেই হইবে। ইহা যে তাহার কল্পনারও অতীত।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এইটুকু যে, এমন জটিল অবস্থায় লবঙ্গলতা সহসা সকল ঔদাস্য কাটাইয়া দুইটি কথায় কিশোরীর চিত্তে এমন একটা দোলা দিল যে সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল।

আফিসের অবস্থা, বদলীর কথা ও মেসে থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একান্ত প্রয়োজন বোধেই কিশোরী স্ত্রীর অভিমত চাহিয়াছিল; যদিও তাহার মনে এই ধারণাই দৃঢ় ছিল যে, সে ইহাতে সায়ও দিবে না, বাধাও তুলিবে না; বড় জোর, এইটুকুই বলিবে,—আমি কি জানি! যা তোমার খুসী হয় কর!

কিন্তু এবার কিশোরী স্তব্ধ-বিস্ময়ে শুনিল, স্ত্রী তাহার দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল করিয়া গভীর আগ্রহের সুরে কহিতেছে,—আমি যদি একটা অনুরোধ করি, রাখ্‌বে?

অনুরোধ! বিবাহের পর সাতটি বৎসর অনন্ত কাল-সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু পত্নীর কোনও অনুরোধ কোনও দিন কি কিশোরীর শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে? অপূর্ব্ব পুলকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; বদলীর কথা, কলিকাতার মেসে বাসা লইবার দুশ্চিন্তা সমস্তই কোথায় তলাইয়া গেল, স্মিতমুখে সে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—"তুমি এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ লবঙ্গ? বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না—তাই কথাটা এখনো চেপে রেখেছ?"

অপূর্ব্ব এক হাসির ঝিলিক উঠিয়া লবঙ্গলতার সারা মুখখানা উদ্ভাসিত

করিয়া দিল ; মনের কোন্ নিভৃত কোণে এই হাসি এতদিন সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই জানে। মুগ্ধ স্বামীর দিকে এই হাসিমাখা মুখে চাহিয়া সে কহিল,—"বিশ্বাসের কথা নয় মশাই, ভয়ের কথা ত বটেই, যদি কথাটা না থাকে, মুখখানা নষ্ট হয় !"

কিশোরী অভিভূত, আত্মহারা ; লবঙ্গলতার মুখে এমন হাসিও যেমন সে দেখে নাই, প্রাণ খুলিয়া এ ভাবে তাহাকে কথা কহিতেও কোনও দিন শুনে নাই। সে তন্ময় হইয়া বদ্ধদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল।

লবঙ্গলতা এবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"তা' হ'লে কথাটা বলিই শোনো—চাকরী তোমার ছাড়া হবে না, আর কলকেতার মেসেও একলা তুমি থাক্‌তে পাবে না।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কিন্তু পত্নীর এ কি বিচিত্র আব্দার? ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কিশোরী কহিল,—"কিন্তু চাকরী রাখ্‌তে হলে কলকেতায় থাক্‌তেই হবে।"

লবঙ্গ এবার গম্ভীর মুখে কহিল,—"তা ত হবেই। এখান থেকে যে ডেলী-প্যাসেঞ্জার হয়ে কলকেতার চাকরী করা চলে না—এটুকু বোঝ্‌বার মত বুদ্ধি আমার আছে।"

সংশয়বিজড়িত কণ্ঠে কিশোরী প্রশ্ন করিল,—"তবে?"

লবঙ্গ তৎক্ষণাৎ অতি সংক্ষেপেই সংশয়টির সমাধান করিয়া দিল এই ভাবে,—"কলকেতায় থাক্‌তেই হবে, কিন্তু বারোয়ারী মেসে নয়—আলাদা বাসায় ; আর, সেখানে তুমি যে একলা থাক্‌বে, তা হবে না ; আমাকেও থাক্‌তে হবে। এখানকার পাট তুলে আমাকে নিয়ে ছুটি ফুরোলেই কলকেতায় চলো। এই অনুরোধই আমি জানিয়েছি, বুঝ্‌লে?"

বুঝিবার যদিও অনেক কিছুই ছিল, ভাবিবার মত কত সমস্যাই অন্তরায় হইয়া ছুটিয়া আসিত, কিন্তু কিশোরী কোনও দিকে না চাহিয়া, পারিপার্শ্বিক অন্তরায়গুলিকে জাগ্রত হইবার অবসর না দিয়াই লবঙ্গলতার অনুরোধ রক্ষা করিতে নূতন উদ্যমে ব্রতী হইল।

ছয়

সাত বৎসর পরের কথা।

ইহার প্রথম তিনটি বৎসরের ইতিহাস এই প্রেমোন্মত্ত দম্পতির সহরবাসের ও সহরের বৈচিত্র্যময় সুখসম্ভোগের স্বচ্ছন্দতায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু তাহার পরেই সুখের আলোক স্তিমিত হইয়া যায় এবং দুর্দ্দিনের অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতে থাকে।

সহরে বাস করিয়া, সুখ ও সুবিধার সন্ধান পাইয়া আবাল্যের পরিচিত পল্লীর বাসস্থান সুবিধাবাদী কিশোরীর নিকট ক্রমশঃই দুর্গম ও দুর্ভোগের পীঠস্থানে পরিণত হয়। এরূপ অবস্থায় আর দশজন মোহগ্রস্ত পল্লীবাসীর যে পরিণাম হয়, পল্লীর শ্যামল প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়া অনায়াসলভ্য নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা করিয়া, উচ্চ মূল্যে সহরের সুখ সম্ভোগ ক্রয় করিতে লালায়িত হয়, এবং অবশেষে তাহা দুর্ভোগ হইয়া দাঁড়ায়,—তাহাই এ ক্ষেত্রে হইয়াছে। মোহমুগ্ধের মত কিশোরী যখন লবঙ্গকে লইয়া কলিকাতায় আসে, তখন হাতে অর্থ ছিল, যে পল্লীতে সে প্রতিপালিত, যাহাকে উপেক্ষা করিয়া সহরে আসিয়াছিল, তাহারই শস্যময় শ্যামাঙ্গ নিঙড়াইয়া এই কয় বৎসর সে সহরবাসের ব্যয় চালাইয়াছে; নতুবা, চল্লিশ টাকা বেতনভুক কেরাণীর পক্ষে বহুবাজার অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা পাতিয়া স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার অবসর কোথায়? কিন্তু তাহার পর?

মউমালির সমস্ত মধুই তিন বৎসরে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, মধুচক্র এখন দায়গ্রস্ত হইয়া অন্যের আয়ত্তে। মউমালির অধিবাসীরা প্রথম প্রথম কিশোরীকে ফিরাইতে কত চেষ্টাই করিয়াছিল, তাহার এই স্পৃহাকে নাশচিকীর্ষা বলিয়া ধিক্কার দিয়াছিল, কিশোরী শুনে নাই। লবঙ্গ বলিত, ইহা তাহাদের হিংসা। কিশোরী তখন হাসিয়াছিল। কিন্তু এখন ঘোষালমহাশয়ের ভিটার পরিণাম দেখিয়া তাহারা যেমন কাঁদে, কিশোরীর পরিণামের সন্ধান লইয়া তেমনই হাসে। বলে,—এ যে প্রকৃতির প্রতিশোধ, হবে না ? যার কোলে মানুষ, তাকেই এত অবহেলা ; এখন ঠেলা সামলাও।

কিন্তু ঠেলা যে এখন চারিদিক দিয়া কিশোরীর গলা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যখন কলিকাতায় প্রথম আসিয়াছিল, তখন তাহারা ছিল— দুটি প্রাণ, দুটি প্রাণী। এখন আরও পাঁচটি নূতন প্রাণীর সমাগম হইয়াছে তাহাদের সংসারে এবং প্রায় প্রতি বৎসরই এক একটি অনাগতের আবির্ভাব সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু সে অনুপাতে কিশোরীর ন্যায় অল্প বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কেরাণীর বেতন প্রতি বৎসর বাড়িবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। সাত বৎসরে তাহার মাহিনা চল্লিশের কোটা পার হইয়া পঞ্চাশে উঠিয়াছে।

স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিবার সাধ এখন আর নাই, যেহেতু সামর্থ্যের অভাব। প্রথম যখন ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাড়ীতে আসিয়া উঠে, লবঙ্গ বড় সাধ করিয়াই তাহার মা, ভ্রাতৃজায়া ও ভগিনীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, তাহার সহরের সৌভাগ্য দেখিয়া নিমন্ত্রিতেরা কত খুসীই হইবেন! কিন্তু সকলেই যখন একবাক্যে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"এ যে ঠিক সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে পাকা সেৎখানায় বাসা বাঁধা হয়েছে লবি! তোর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে, সেখানকার ঐশ্বর্য্যি দেখে শুনে আমাদের

চোখগুলো জুড়িয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলুম—কত পুণ্যেই অমন ঘর পেয়েছিস্! সে সব ফেলে সহরের খাঁচায় এসে ঢুক্‌লি কোন দুঃখে? দূর!—"এ কথায় লবঙ্গর মুখখানা তখন কালো হইয়া গিয়াছিল, মনে মনে এই পরমাত্মীয়দের প্রতি কত রাগই সে করিয়াছিল!

কিন্তু এখন?

এখন প্রায় প্রতিদিন একটু অবসর পাইলেই অপরিসর গৃহকোণে বসিয়া লবঙ্গলতা অতীতের সেই সব কথা তন্ময় হইয়া ভাবে। সত্যই ত, কি তাহারা ছিল, আর আজ কি হইয়াছে! পিতৃগৃহে যতদিন সে ছিল, যদিও কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিত না, তথাপি পিতার দৈনিক উপায় সত্ত্বেও যে অভাব প্রায়ই তাহাদের সংসারে উঁকি দিত, তাহা যে তাহার চক্ষুতে ধরা দেয় নাই, তাহা নয়। কিন্তু মউমালির শ্বশুরবাড়ীতে যদিও সে অতৃপ্তি ও অসন্তোষকে সাথী করিয়া ঢুকিয়াছিল, কিন্তু এই অভাবটির সহিত কোনও দিন কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে? কমলা যেন সেখানে প্রকৃতির দেওয়া পণ্যসম্ভারে আঁচলখানি ভরিয়া তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন, সে গ্রাহ্য করে নাই, লক্ষ্য করে নাই, আনন্দের আতিশয্যে ছুটে নাই কোন দিন!

আর, আজ কি অবস্থা তাহার হইয়াছে? ভাবিয়া ভাবিয়া স্বামীর চেহারা কঙ্কালসার, মুখে কালিমা, লালিমার চিহ্নটুকুও মুছিয়া গিয়াছে। চারিদিকেই দেনা, সবাই করে কঠোর তাগাদা; স্বামী আফিসে গেলে, লবঙ্গকেও তাগাদাকারীদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। যাহারা আর দশজনের সহিত বারোয়ারী বাড়ীতে বাস করে, তাহাদের আবার আব্রু, তাহাদের আবার ইজ্জত, তাহাদের মান-অপমানের ভয়! লবঙ্গকে সবই সহিতে হইয়াছে, এখন সবই সে নিরুত্তরে সহ্য করে। কেন করিবে না? সে-ই যে সাধ করিয়া এই অভাবের নরককুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে, পল্লী-

প্রকৃতির দুর্লভ সুষমা সে যে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, উপেক্ষা করিয়া, পদদলিত করিয়া—স্বামীকে লইয়া আরামের মণিকোঠায় উঠিয়াছিল! এজন্য কত বড় সাধনাই না তাহাকে করিতে হইয়াছে! মুখের হাসি চাপিয়া, সবার চিত্তে বিক্ষোপ তুলিয়া, যাহা সে ভাবিয়াছিল, তাহারই বুভুক্ষু-চিত্তের সাধনায় আজ তাহা সার্থক হইয়াছে;—সুধাটুকু নিঃশেষ করিয়া, গরল দেখিয়া আজ পিছাইলে চলিবে কেন, তাহাকেই যে হলাহল পান করিতে হইবে।

সহসা লবঙ্গলতার চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল স্বামীর পদশব্দে। চমকিত হইয়া চাহিতেই লবঙ্গ দেখিল, কিশোরীর হাতে লাল ও গোলাপী রঙের কাগজে ছাপা কয়েকখানা চিঠি, মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

উদাসদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া লবঙ্গ কহিল,—"নতুন-খাতার নেমন্তন্ন?"

শুষ্ককণ্ঠে কিশোরী কহিল,—"হাঁ। সাতখানা এসেছে সাত জায়গা থেকে, অথচ হাতে—"

কথাটা আর সমাপ্ত হইল না অথবা সমাপ্ত করিবার অবসরটুকু না দিয়াই লবঙ্গ কহিল,—"চালও বাড়ন্ত, কয়লা নেই, তেল ফুরিয়েছে, ডালের টিনগুলোও খালি হয়েছে; আর শুন্‌বে?"

অসহিষ্ণুভাবে কিশোরী কহিল,—"থাক্, আজ বছরের প্রথম দিন, পয়লা বোশেখ; নেই নেই ত রোজই শুনি, আজ আর নাই শোনালে—"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের একটা উজ্জ্বল স্মৃতি কিশোরীর দুটি ছল ছল চক্ষুর উপর যেন ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকখানাও একটা অব্যক্ত বেদনায় টনটন করিতে লাগিল।

লবঙ্গ এতক্ষণ স্বামীর মুখখানির দিকেই চাহিয়াছিল, তাহার চক্ষু তখন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সমস্ত দেহের শোণিতপ্রবাহ বুঝি জুয়ারের

জলের গতিতে উপরের দিকেই ছুটিয়াছিল। দেহের বিকৃতিতে কণ্ঠের স্বরও বুঝি বিকৃত হইয়াছিল, উত্তেজিত কণ্ঠে লবঙ্গলতা কহিল,—"মউমালির কথা মনে পড়্ছে না? সেখানকার পয়লা বোশেখের ঘটা, বাবার দরাজ হাতের দান, এই হতভাগীর পোড়া মুখখানাতে হাসিটুকু ফোটাবার জন্যে সাধাসাধি, আরও কত কি,—ও!"

কিশোরী গাঢ়স্বরে ডাকিল,—"লবঙ্গ!"

লবঙ্গ তখন স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বার বার মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে কহিল,—"ওগো, আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও; আমি যে সেই মহাপুরুষের অভিশাপ কুড়িয়েছি, আমিই যে তোমাকে নরকে টেনে এনেছি, আমার জন্যই তোমার এই অবস্থা! ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে মার, আমার চুলের মুঠো ধরে শাস্তি দাও—যা তোমার প্রাণ চায়।"

রোরুদ্যমানা পত্নীকে দুই হাতে তুলিয়া তাহার অজস্র অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে কিশোরী স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—"দোষ ত শুধু তোমার নয় লবঙ্গ আমিও কি কম অপরাধী? আমি অবহেলা করেছি আমার জন্মভূমিকে, পল্লীলক্ষ্মীকে, প্রকৃতিদেবীকে; তারই প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে; এযে—প্রকৃতির প্রতিশোধ!"

লবঙ্গ সাশ্রুলোচনে আর্ত্তস্বরে কহিল,—"ওগো, ভুল, আমারই ভুল,—আর জন্মজন্মান্তর ধরে আমাকেই যোগাতে হবে এর মাশুল!"

খড়িবাজ

পাঁচ

এক

হাবুলের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাহার সহিত আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। হাবুল সে সময় তাহার মামার বাড়ী মূলাজোড়ে থাকে ও সেখানকার হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। আমি থাকি এলাহাবাদে, বাবা সেখানে সরকারী চাকুরী করিতেন। স্থানীয় অ্যাংলো-বেঙ্গলী হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র আমি, প্রতি বৎসরই ক্লাশ-প্রমোশনের সময় প্রথম স্থানটি বরাবর অধিকার করিয়া আসায়, ভাল ছেলে বলিয়া আমার একটা খ্যাতি ছিল এবং তজ্জন্য একটা অহঙ্কার আমার মনের ভিতর উঁকি দিত। সে বৎসরও সগৌরবে যখন দশম শ্রেণীতে (বাঙ্গালা দেশের প্রথম শ্রেণী) প্রমোশন পাই, তখন আমি তেরো-বছরে পড়িয়াছি। ক্লাশ প্রমোশনের পরেই গ্রীষ্মের ছুটী আসিয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে আমার বাবা ও মায়ের নিকট মাসীমার এক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আসে যে, গ্রীষ্মের ছুটীটা আমি যেন তাঁহার বাড়ীতে কাটাইয়া আসি। বাবা ও মা সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

মাসীমার বাড়ীও মূলাজোড়ে। মেসোমহাশয় কলিকাতার একটা নামজাদা সদাগরী আফিসের বড়বাবু। মূলাজোড়ের মধ্যে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। এলাহাবাদে বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতাম না, কিন্তু মাসীর বাড়ীতে গিয়া, মাসীমার অতি মিশুক ও সদালাপী এবং প্রায় সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে না মিশিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সকলের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। সে বয়সের সে ভাবটি যে কত মধুর, যৌবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া সে কথা মনে করিলেও যেন একটা অপরিসীম পরিতৃপ্তি আসে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া আশ্রয় লইতেই মাস্‌তুতো বোন পাঁচী চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ক্ষিতীশদা, এস, ততক্ষণ আমরা গল্প করি ; ডুটোর ভোঁ বাজলেই আমরা ছুটবো সবাই বাঁড়ুয্যের পূজোর দালানে।"

আমি একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন, বল ত ?"

পাঁচী অবাক্ হইয়া অপূর্ব্ব মুখভঙ্গীতে বলিল,—"ও মা জান না বুঝি, তা তুমিই বা জানবে কি ক'রে বাপু, আজ ত সবে এসেছ ? শোনো তবে, ডুটোর ভোঁ যেমনই বাজে, অমনই আমাদের ওখানে ছুটতে হয়। হাবুলদা সেখানে কত কাণ্ডই করে, দেখলে একবারে অবাক্ হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন করিলাম,—"হাবুল-দা'টি কে ?"

উত্তর হইল,—"হাবুল-দা'কে জান না ? তার নামও শোনো নি তুমি, ক্ষিতীশদা ? সে ভারী ওস্তাদ ছেলে ; গান গায়, নাচে, কত রকমের সঙ দেখায়, দেখে-শুনে হেসে আর বাঁচি না। কিন্তু এদিকে আবার এমনি হুঁসিয়ার সে, একটা ক'রে পয়সা না নিয়ে ছাড়বে না।"

মাসতুতো ভাই ভজা বলিল,—"পয়সা আছে ত তোমার কাছে, ক্ষিতীশ দা, নইলে কিন্তু সে শুনতে দেবে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আছে।"

পাঁচী সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল,—"কিন্তু দেখো ক্ষিতীশদা', যেন এ-সব কথা আর কেউ না শোনে। বাবা মাকে যেন কথ্‌খনো ব'ল না।"

পাঁচীদের বাড়ীর গায়েই তাদের প্রশস্ত বাগান, বাগানের পাশেই একটা পুরাতন পুষ্করিণী ; তার প্রান্তেই পল্লীপথ এবং পথটির সংযোগস্থলেই বাঁড়ুয্যেদের পুরাতন পূজার দালান, পোড়ো-বাড়ীর মতই পড়িয়া আছে এবং পল্লীর বালক-বালিকাদের খেলাঘরে পরিণত হইয়াছে।

এইখানেই হাবুলের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। দিব্য

নাদুস-নুদুস দেহ, চালতার মত থ্যাবড়া অথচ পূরন্ত মুখ, সুশ্রী চেহারার একটি ছেলে দুই হাতে দুই টুকরা কাঠ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সন্নিহিত কোনও মিলের বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক দিয়া পঙ্গপালের মত বালক-বালিকাদিগকে সমবেত হইতে দেখিয়া তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটি যেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল। আমাকে নবাগত ও বয়সে অপেক্ষাকৃত বড় দেখিয়া, তাহার মনটি বোধ হয় সন্দেহে দুলিয়া উঠিতেছিল, তাই পাঁচীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কে ?"

পাঁচী হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "চেন না একে ? আমার মাসতুতো ভাই যে। এলাহাবাদে থাকে, ভারী ভাল ছেলে—"

পাঁচীর মুখের কথা কাড়িয়া ভজা বলিল,—"ফাষ্ট ক্লাসে উঠেছে এবার ফার্ষ্ট হয়ে। তোর খেলা দেখতে ধ'রে এনেছি একে, এর নাম—ক্ষিতীশ।"

হাবুল তাহার সেই চকচকে চোখ দুইটি আমার দিকে তুলিয়া সচকিতে আমার আপাদ্-মস্তক দেখিয়া লইল, তাহার পর চ্যাটালো মুখখানা ওষ্ঠ-যুগলের সহায়তায় রূপান্তরিত করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরক্ষণে বলিল—"পয়সা এনেছে ?"

অপ্রতিভ হইবার আশঙ্কায় পাঁচীর কথা কহিবার আগেই বলিয়া উঠিলাম—"এনেছি।"

হাবুল একবারে আমার সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিয়া বলিল—"দাও তবে।"

পকেট হইতে দুইটা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলাম। হাবুল পয়সা দুটা তাহার কোঁচড়ে রাখিয়া বলিল, "—পাঁচী. তুই মিছে বলিস্ নি, সত্যি এ ভাল ছেলে। এর জন্যে আজ খেলা দেখাব। আজকের খেলার নাম হচ্ছে—উড়েদের হাপু খেলা; দেখলেই অবাক্ হতে হবে। এখন পয়সা ফেল সকলে।" আমি ছাড়া

আরও এগারটি ছেলে-মেয়ে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নয় জন একটি করিয়া পয়সা দিল। দুই জন বলিল,—"আজ পয়সা পাইনি হাবুলদা' কাল দেব।"

হাবুলদা' মুখখানা কালো করিয়া বলিল, "এ কিন্তু ভাল হ'ল না। যা হোক, কাল যেন কিছুতেই ভুল না হয়।"

তাহার পর সে খেলা দেখাইতে মনোনিবেশ করিল। দুই হাতের সেই দুইটি পাতলা কাষ্ঠখণ্ড হাতে, পিঠে, কাঁধে ও উরুদেশে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আঘাত করিতে করিতে, মুখে এক অদ্ভুত আরাব তুলিয়া হরবোলার মত প্রায় একটি ঘণ্টাব্যাপী সে যে কসরৎ করিল ও আমাদিগকে যে অভিনব আনন্দ দিল, তাহা যেন এখন চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। দশ বছরের একটা ছেলের এই কীর্ত্তি দেখিয়া আমি একবারে স্তম্ভিত।

তাহার পর নিত্যই নূতন নূতন আমোদ-প্রমোদের সৃষ্টি করিয়া সে আমাদের যেমন বিস্ময়-বর্দ্ধন করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোঁচড়ও পয়সায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে দিন আমরা সমবেত হইতে সে বলিল, "আজ আর কোনও খেলা তোদের দেখাব না—মজার মজার 'গালাগাল' শোনাব। অনেক কষ্ট ক'রে চটকলের বস্তী থেকে আমি শিখে এসেছি।" বলেই সে তাহার শিক্ষিত বিদ্যার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ দিয়া যেন খই ফুটিয়া ছুটিতেছিল। এ পর্য্যন্ত এ সব গালিগালাজ কখনও শুনি নাই—অনেক কথার অর্থ না বুঝিয়া হাবুলের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকি, দেখি, মুখখানা তাহার চাকার মত ঘুরিতেছে।

হঠাৎ কে এক জন ছুটিয়া আসিয়া হাবুলের চলন্ত মুখখানা চাপিয়া ধরিল এবং তাহাতে এক থাবা গোময় লেপিয়া দিল। ভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, হাবুলের মামা। সে দিন যে শনিবার, সে খেয়াল কাহারও ছিল না। মামা আড়াইটার ট্রেণে বাড়ী ফিরিয়া ভাগিনার মুখে মধুবর্ষণ দেখিয়া,

গোময় দিয়া লেপিয়া দিয়াছিলেন। আমরা তখন আমাদের অধিকারীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াই বুদ্ধিমানের মত স্থানত্যাগ করিয়াছিলাম।

হাবুলের সঙ্গে আমার নিভৃত আলাপও যে জমে নাই, তাহা নহে। এই সূত্রে আমি যেন তাহার প্রতি অনেকটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মানুষকে আশ্চর্য্য রকমে আকৃষ্ট করিবার একটা ক্ষমতা সে সেই বয়স হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তাহাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি,—"এ ভাবে পয়সাগুলো নিয়ে তুই করিস কি ?"

সে অম্লান-বদনে উত্তর দেয়,—বাবাকে দিই। আমি ত চমৎকৃত ! বাবার কাছ হইতে আমরাই চিরদিন পয়সা পাই—আর এ কি না ইতরের মত পয়সা উপায় ক'রে সেই পয়সা তাহার বাবাকে দেয় !

আমার মনের ভাব যেন সে বুঝিয়া সংশয়টা আমার এই বলিয়া ভাঙিয়া দিয়া আমাকে অবাক করিয়া দেয়—"আমার বাবা বেকার, তার ওপর দু তিনটে নেশা আছে তাঁর। তিনটি বছর আমরা মামার বাড়ী আছি। মামা ভাত-কাপড় দেন, কিন্তু একটা পয়সা যদি বাবা কখনও চান, অমনি দু'শো কথা শুনিয়ে দেন। তাই না আমি এই রকম ক'রে পয়সা উপায় ক'রে বাবাকে দিই। এই পয়সায় বাবার নেশা চলে।"

কথাটা শুনিয়া সেই বয়সেই আমার মনখানি যেন ঘৃণায় ও লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। মানুষের প্রবৃত্তি কি এত নিম্নে নামিয়া আসিতে পারে! প্রশ্ন করিয়াছিলাম,—"তোর মা কিছু বলে না ?"

হাবুল কথাটার উত্তরে ভয়ার্ত্তের ভঙ্গীতে বলিয়াছিল,—"মা জানলে কি রক্ষে রাখতেন, ভাই ? একে ত মামার বাড়ীর ভাত তিনি বিষ মনে ক'রে মুখে দেন,—এ কথা শুনলে হয় ত গলায় দড়ি দিয়ে মরবেন।"

ইহার অল্পদিন পরেই হাবুলের কীর্ত্তি যেমন ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাবুলের

বাবারও এক জুয়াচুরির ব্যাপার প্রকাশ পাইয়া পাড়ায় টি টি পড়িয়া যায়। হাবুলের মামা ক্রোধে অভিভূত হইয়া হাবুলের বাবাকে বাড়ী হইতে সেই দিনই লাঞ্ছিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। স্বামীর সে লাঞ্ছনা হতভাগিনী সাধ্বীর বুকে তীরের মত বিঁধিয়াছিল,—তিনিও ভ্রাতার অন্ন ও আশ্রয় উপেক্ষা করিয়া—হাবুলের হাত ধরিয়া হতভাগ্য স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

দুই

বারো বৎসর পরের কথা। হাবুলের কথার সঙ্গে সে বয়সের, সে সময়কার সকল কথাই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। গ্র্যাজুয়েট হইয়া, বাবা যে সরকারী আফিসে কায করিতেন, সেই আপিসেই মোটা বেতনের একটা চাকুরী পাইয়াছি। বাবা পেনসন লইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন, মাও সেইখানে। স্ত্রী ও ছোট একটি পুত্র লইয়া আমি এলাহাবাদেই থাকি। ছুটী পাইলে সপরিবার কাশী যাই এবং মধ্যে মধ্যে বাবা ও মা প্রয়াগে আসিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। এই ভাবে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে আমাদের জীবনযাত্রা চলিতেছিল।

এক দিন আফিসে বসিয়া ফাইলের কাগজ-পত্রে সহি করিতেছি, এমন সময় আমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ব্যগ্রভাবে আমার টেবলের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"শুনেছেন স্যর, ষ্ট্যাম্প ডিপার্টমেণ্টের পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী পুলিশ কেসে পড়েছে।"

ষ্ট্যাম্পের আদান-প্রদান সূত্রে এই অপূর্ব্ব নামটির সঙ্গে পরিচয় আমার থাকিলেও, নামের মালিকাটির সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটে নাই। সহকারীর দিকে মুখটি তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"ব্যাপারখানা কি?"

সহকারী বলিলেন,—"ব্যাপার খুবই গুরুতর। এই ছকরাকে আপনি চেনেন না বোধ হয়, কিন্তু আমার সঙ্গে জানাশুনা আছে, ভারি ধড়িবাজ ছেলে; ভাবে যদি উচ্ছে, বলে—পটল! অথচ মুখ তার এমন মিষ্টি, আর কথা কহিবার এমন কায়দা, তা আর কি বলব!"

আমি একটু অধৈর্য্য হইয়াই বলিলাম,—"এখন বে-কায়দাটা কি করেছে, তাই বল না, শুনি।"

"আড়াইশো টাকার ষ্ট্যাম্প গরমিল। ষ্ট্যাম্প-অফিসার যোগেন বাবু হঠাৎ আজ আফিসে এসেই চেক্ করতে চান। ছোকরা শুনেই অমনি ব'লে উঠে, আমার শরীরটা কেমন করছে—বাইরে থেকে আসছি!—আফিসারের মনে সন্দেহ প্রবল হয়। সম্ভবতঃ কোন সূত্রে আগেই তিনি সন্দেহজনক সংবাদ কিছু পেয়ে থাকবেন। পার্থসারথিকে দুটো ধমক দিতেই সে ঠিক হয়ে যায়। হিসাব ক'রে দেখা গেল—আড়াইশো টাকার ষ্ট্যাম্প সর্ট।"

"আফিসার ফোন করতেই পুলিস আফিস থেকে মুখুজ্যে সাহেব নিজে এসেছেন। বেচারার কোমরে দড়ি পর্য্যন্ত বাঁধা হয়েছে, দেখে এলুম—কেউ জামিন হ'তে চায়না।"

এই অপ্রীতিকর সংবাদটা শুনিয়াই মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। এতবড় আফিসে এতগুলি লোকের সম্মুখে এক জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর এই দুর্নাম ও দুর্গতির অংশ, যেন পরোক্ষভাবে আমার উপরেও আসিয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। ব্যথার সুরে প্রশ্ন করিলাম—"সে ছোকরা কি বলতে চায় এখন?"

"সে বলে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এর বিন্দু-বিসর্গ কিছু জানি না। তবুও, যদি আমাকে ঘণ্টা তিনেক সময় দেওয়া হয়, আমি এ টাকাটা দিয়ে দিতে পারি।"

"ওঁরা কি বলছেন? এতে রাজী নন? তবুও মুখুয্যে সাহেব ছোকরাকে জেলে পূরতে চান? ভাল কথা, আফিসে ওর সিকিউরিটি নেই?"

"শুনছিলুম, পার্শন্যাল সিকিউরিটি না কি আছে। কিন্তু ওর হয়ে কেউ দাঁড়াতে চায় না, একটু তদ্বির করলে হয় ত—"

কথাটা শুনিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। পার্শন্যাল সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও এবং টাকাটা দিতে চাহিতেছে যখন, তবুও কি তাহাকে ফেরানো সম্ভবপর নহে। আমিও ত বাঙ্গালী—বিপন্ন বাঙ্গালীর জন্য এই প্রবাসে যদি যথাসাধ্য চেষ্টা না করি, তা হইলে এ কলঙ্ক কি আমাকেও স্পর্শ করিবে না।

আমাকে দেখিয়াই ষ্ট্যাম্প আফিসার সেকহ্যাণ্ড করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মুখার্জ্জী সাহেবকে নমস্কার করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'ক্ষিতীশ যে! ব্যাপার শুনেছ ত?'—ইনি আমার পিতৃবন্ধু এবং আমার প্রতি স্নেহও প্রচুর! তাঁহার শিকার হাত-বেড়ী ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। পার্থসারথিকে দেখিলাম। একুশ বাইশ বছরের দিব্য ফিটফাট্ সুশ্রী তরুণ যুবা; কে বলিবে, এরূপ অপরাধ তাহার দ্বারা সম্ভব। ছোকরাকে সেই অবস্থায় দেখিয়াই আমার অন্তর যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। আমি করযোড়ে মিনতির সুরে বলিলাম,—"আপনাদের দুজনের কাছেই আমার অনুরোধ, দয়া ক'রে এর বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে, নজরবন্দী ক'রে রাখবার হুকুম হোক।"

আফিসার অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে মুখার্জ্জী সাহেবের দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন,—"এর বিরুদ্ধে যে চার্জ্জ, তা শুনেছ?"

বিনীতভাবে বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ, আমি নিজের রিস্কেই এ অনুরোধ করছি।"

অনুরোধ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। আসামীকে প্রভুর আদেশে মুক্ত করিয়া দিয়া মুখার্জ্জী সাহেবের আরদালী বাহিরে দরজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে পার্থ সারথির অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও অবকাশ ছিল না। এ অবস্থায় তাহাকে চালান দেওয়াই যে বিধেয়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু একটামাত্র সূত্র ছিল—এলাহাবাদের সর্ব্ব-জনমান্য বিশিষ্ট বাঙ্গালী সত্যভূষণ বাবু ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং জামিন হওয়াতেই পার্থসারথিকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কথা তুলিতেই মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন,—"সেই জন্যই ত ওর কোমরে দড়ি বেঁধে হাইকোর্টে সত্যভূষণ বাবুর কাছেই ওকে নিয়ে যাচ্ছিলাম হে।"

পার্থসারথি এই সময় সরোদনে বলিয়া উঠিল,—"নিজে ত মুখ পুড়িয়েছি, তাঁর মুখখানা আর পোড়াবেন না স্যর—হাইকোর্টে তাঁর সামনে আমাকে নিয়ে গিয়ে। এ যাত্রা আমাকে রেহাই দিন। টাকা তিনিই দিয়ে দেবেন স্যর—"

মুখার্জ্জী সাহেব দুই চক্ষু পাকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া এক ধমক দিতেই তাহার উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, পার্থসারথির মত এক তরুণ যুবার ভবিষ্যৎরক্ষা সম্বন্ধে যথাসাধ্য ওকালতী ও নানা যুক্তি দেখাইয়া, পরদিন দশটার মধ্যে ঐ টাকার ষ্ট্যাম্প বুঝাইয়া দিবার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহাকে সে যাত্রার মত মুক্ত করিয়া লইলাম। আফিসারও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী, আর কোনও আপত্তি তুলেন নাই।

পার্থসারথিকে লইয়া নিজের কামরায় আসিতেই সে সহসা বলিয়া উঠিল,—"ক্ষিতীশদা, আমাকে বোধ হয় চিনতে পারেন নি?"

আমি বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম।

সত্যই এ ছোকরা আমার পরিচিত না কি? কিন্তু কবে বা কোথায় তাহাকে যে দেখিয়াছি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

পার্থসারথি আমার সংশয়সঙ্কুল অবস্থা বোধ হয় অনুমান করিয়াই বলিল,—"ছেলেবেলায় আপনি একবার মূলাজোড়ে আপনার মাসীর বাড়ী গিয়েছিলেন, সেখানে বাঁড়ুয্যেদের পোড়ো দালানে একটি ছেলে কত কি খেলা দেখাতো, মনে পড়ে আপনার?"

বহুদিনের কথা—যাহা সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল; যেন একবারে দুই চক্ষুর উপর ছায়াচিত্রের মত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। পার্থসারথির দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম,—"হাঁ—মনে পড়ে; কিন্তু তুমি সে কথা জানলে কি ক'রে? তবে কি, তুমি—তুমিই—সেই—"

পার্থসারথি হাসিয়া বলিল,—"হাঁ, ক্ষিতীশ-দা, আমিই সেই হাবুল—যাকে আপনি সে সময় ভারী ভালবেসেছিলেন।"

বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। সোল্লাসে বলিয়া উঠিলাম,—"তুমি—হাবুল! তোমার আজ এই পরিণাম? ছেলেবেলায় তোমাকে সং দিতে দেখেছিলুম, আর আজ দেখলুম, তুমিই সং হয়ে দাঁড়িয়েছ আফিসে সকলের চোখের সামনে? যা হোক, সব কথা আমাকে খুলে বল ত শুনি; আমার ভারী আগ্রহ হচ্ছে।"

হাবুল যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই,—মূলাজোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা কাশীতে আসিয়া উঠে। ভিক্ষা করিয়া ও সত্রে খাইয়া সেখানে কোনরকমে তাহাদের দিন কাটিতে থাকে। শেষে তাহার বাবা যাত্রীতোলার ব্যবসায় আরম্ভ করে। এই সূত্রে তাদের দূর-আত্মীয়স্থানীয় এক বড়লোক এই সর্ত্তে হাবুলকে গৃহ-জামাতা করিয়া লন

যে, পিতামাতার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না বা সে তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবে না। তাহার পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে প্রদান করিবেন। সেই সর্ত্তানুসারে হাবুল সম্বলপুরে গিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করে ও সেইখানে লেখাপড়া শিখিতে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে আই-এ পড়িবার জন্য এলাহাবাদে আসে। এই সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবুলের একান্ত অনুরোধে তাহার শ্বশুর কন্যাকে কয়েক দিনের জন্য কাশীতে পাঠান। কন্যাকে লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে মনোমালিন্য হওয়ায় সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া এই চাকুরী যোগাড় করিয়া লয়। সত্যভূষণ বাবু বরাবর তাহাকে স্নেহ করিতেন, তিনিই তাহার জামীন হন এবং নিজের বাড়ীতেই তাহাকে আশ্রয় দেন। কিন্তু আড়াইশো টাকার ষ্ট্যাম্প কি করিয়া যে তাহার ডেস্ক হইতে সর্ট হইয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।

* * * *

সত্যভূষণ বাবু আমার মুখে ঘটনা শুনিয়াই একবারে অগ্নি-অবতার। গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"কে আছিস্ হাণ্টারটা নিয়ে আয় ত!"—কিন্তু যে লোক যত শীঘ্র রাগিয়া উঠে, তাহার রাগও তত শীঘ্র নামে। তাঁহাকে শান্ত করিতে বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ আমাকে আড়াইশো টাকার নোট দিয়া বলিলেন,—"জেল হওয়াই ওর উচিত ছিল। আমি তা হ'লে খুসী হতুম। এ যে ঝাড়ের দোষ,—যতই তোয়াজ দাও, ভবী ভুলবে কেন? কিন্তু যাই হোক, তুমি বাবা আমার মুখখানা বাঁচিয়ে দিয়েছ, আর ও হতভাগাটার আখেরটাও।"

বুঝিলাম যে, সত্যভূষণ বাবু হাবুলদের সম্বন্ধে সকল তথ্যই জানেন ও তাহার সংবাদ রাখেন।

দিন- কয়েক পরে কি একটা কার্য্যে হাইকোর্টে গিয়েছি,—বার-লাইব্রেরীতে সত্যভূষণ বাবুর সহিত দেখা হইতেই তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"শুনেছ ক্ষিতীশ, হাবুলকে মেসোপটেমিয়ায় চালান ক'রে দিয়েছি?"

সবিস্ময়ে বলিলাম,—"তাই না কি? কিন্তু কোন্ ডিপার্টমেণ্টে চালান করলেন তাকে?"

"যে ডিপার্টমেণ্টে টাকা-পয়সার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই, আছে শুধু গাধার খাটুনি। তাকে ব'লে দিয়েছি, মুখ ত এখানে পুড়িয়ে চলেছ, পার ত ভাল হয়ে ফিরো, নইলে সেখানে মরবার ভাবনা নেই—সব দরজাই খোলা।"

হাবুলের বিবাহসংক্রান্ত সংবাদটা সঠিক জানিতে আমার একটু আগ্রহ ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, ও ত শ্বশুরবাড়ী থেকে রাগ ক'রে চ'লে এলো, কিন্তু বউটির অবস্থা কি হচ্ছে? তিনি বা এখন কোথায়?"

সত্যভূষণ বাবু বলিলেন,—"সে দিকেও বাবাজী যা কীর্ত্তি ক'রে এসেছেন, সেও চমৎকার! আমি কি জানতাম কিছু ছাই। এক দিন এক ভদ্রলোক হঠাৎ আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। শুনলাম, সেই হাবুলের শ্বশুর। ভদ্রলোক যা বললেন, সেও অদ্ভুত। বাপ যেই কাশীলাভ করলে, খবর পেয়েই ভদ্রলোক মেয়ে-জামাইকে কাশী পাঠালেন তাঁর কায করতে। সমস্ত খরচও তিনি দেন। কায চুকে গেল, এদের ফেরবার নাম নেই। শেষে ভদ্রলোক নিজে এসে শুনলেন, জামাই বাবাজী ফেরার, সেই সঙ্গে মেয়ের গায়ের গয়নাগুলোও সাবাড়! সেই অবস্থাতেই মেয়েকে নিয়ে যান। মাস-কতক পরে খবর পান, জামাই আমার বাড়ীতে থেকে চাকরী করছে। আমি তখন তাঁকে বুঝিয়ে

বুঝিয়ে বলি, কি আর করবেন বলুন! গোড়াতেই আপনি গলদ করেছেন, এখন আর উপায় নেই। বাপের দোষগুণ সন্তানে বর্ত্তায়; বাপের গুণপণা চোখে দেখেও যে ভুল আপনি করেছেন, তার ফল আপনাকে ভোগ করতেই হবে। তবে আমার কাছে আছে, ভাল আফিসে ঢুকেছে, উন্নতিও হ'তে পারে।"

কিন্তু হাবুল তাহার শ্বশুর সম্বন্ধে আমার কাছে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেই সত্যভূষণ বাবু উত্তেজনাপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "—সব্ ভুয়ো, সব্ ভুয়ো!"

তিন

কল্পনাও করি নাই যে, মিলিটারী একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে বদলী হইয়া সেই সূত্রে আমাকেও বসরাই গোলাপের দেশে রওয়ানা হইতে হইবে এবং সেখানেও হাবুলের চমকপ্রদ কার্য্যকলাপ আমাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে।

বসোরায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার লইবার অব্যবহিত পরেই পার্থ-সারথি চক্রবর্ত্তীর প্রসিদ্ধির কথা শুনিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমরা বসোরায় আফিসররূপে কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত কায করিয়াও এমন কিছু প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই যে, আমাদের নাম লইয়া সর্ব্বত্র যাহার জন্য আলোচনা চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের একটি বৎসর পূর্ব্বে লেবার-কো'রের সামান্য একজন কর্ম্মচারিরূপে আসিয়া হাবুল একেবারে সেণ্ট্রাল ক্যাম্পের কমাণ্ডিং আফিসারের প্রিয়পাত্রের পদটি এমনভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে, তাহার সৌভাগ্য সম্বন্ধে ক্যাম্পের কর্ম্মচারী-দের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিলনা। সকলেরই মুখে একই কথা, এমন তুখোড় ছোকরা মেসোপোটেমিয়ায় আর দুটি আসে নাই; অতবড় দুঁদে

জবরদস্ত কমাণ্ডিং আফিসারকে একেবারে হাতের মুঠোর ভেতর এনে ফেলেছে।

আলোচনা সূত্রে তাহার সৌভাগ্যলাভের যে ইতিবৃত্ত শুনা গেল, তাহা এইরূপ,—মাসখানেক তার কষ্ট আর খাটুনির সীমা ছিলনা। সকলেই জানিত, কমাণ্ডিং আফিসারের 'ব্যাঞ্জো'র বাজনা শুনিবার অত্যন্ত সখ ছিল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কমাণ্ডিং আফিসার সন্ধ্যার সময় চা খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ ক্যাম্পের বাহিরে ব্যাঞ্জোর ঝঙ্কার শুনিয়া তিনি উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া আরদালী ব্যাঞ্জোওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল। পার্থসারথি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মিলিটারী পোষাকে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া মিলিটারী কায়দায় কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাল-মানের ধার ধারিতেননা, ব্যাঞ্জোর বাজনা শুনাই তাঁহার সখ; খুসী হইয়া সাহেব তৎক্ষণাৎ পার্থ-সারথি ওরফে আমাদের হাবুলকে একখানা মোহর বখ্‌শীস করিলেন। হাবুল শুধু সেই সামান্য বখশীসটুকু লইয়াই ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহে এবং সেইটুকু আকাঙ্ক্ষা লইয়াই সে কাট-খড় পোড়াইয়া সত্য সত্য এতটা কসরৎ করে নাই,—সেই সূত্রে সেই দিনই কার্য্য বাগাইয়া লইল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পায়া আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া গেল এবং সাহেবের ক্যাম্পের এলাকার ভিতরেই তাহার বাসস্থান নির্ব্বাচিত হইল।

কয়েক সপ্তাহ পরেই আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা পার্থসারথিকে অধিকতর প্রসিদ্ধ করিয়া দেয়। সাহেব নিজের তাঁবুর ভিতর একখানা ক্যাম্পখাটে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। সাহেবের শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। হঠাৎ রিভলভারের আওয়াজ সাহেবের সুখনিদ্রা ভাঙিয়া দিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই রিভলভার হস্তে পার্থসারথি এবং একটু দূরেই একটা মৃতসর্প, গুলীর আঘাতে তাহার মস্তক

চূর্ণ, দেহেরও মধ্যাংশ জীর্ণপ্রায়। লোকজন ছুটিয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ সবিস্ময়ে সকলেই শুনিল, সাপটা সাহেবের খাটিয়ার উপর উঠিয়াছিল, আর একটু হইলেই দংশন করিত, ঠিক সময় পার্থসারথি সে দৃশ্য দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে একবারে খতম করিয়া দিয়াছে।—সেই স্মরণীয় দিন হইতে পার্থসারথি সাহেবের দক্ষিণহস্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দুষ্টলোক রটাইয়া বেড়ায়, ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভূয়া,—ধড়িবাজ পার্থসারথির কায গুছাইবার একটা অভিনব চাল মাত্র; সদ্যআহৃত একটা সাপ সংগ্রহ করিয়া সে এইভাবে তাঁহার অদৃষ্টের গতি ফিরাইয়া লইয়াছিল।

আমরা যে ক্যাম্পে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেখান হইতে মাইলখানেক তফাতেই হাবুলদের ক্যাম্প। যাই যাই করিয়াও তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত একটি দিনও সাক্ষাৎ করিবার সময় করিয়া লইতে পারি নাই। হঠাৎ সেদিন সকালেই শুনিলাম, কমাণ্ডিং আফিসারের ক্যাম্পে ডাকাত পড়িয়াছিল। একদল আরব গভীর রাত্রিতে ক্যাম্পের একটা অংশ আক্রমণ করে এবং কিন্তু টাকা ও জিনিসপত্র লুঠ করিয়া সৈন্যদল আসিবার পূর্ব্বেই পলায়। পার্থসারথির ক্যাম্পেই না কি এই ডাকাতী হইয়াছে এবং সে একাই ডাকাতদের সহিত লড়িয়াছে।

কাযকর্ম্মের ভিতর একটু সময় করিয়া লইয়া কম্যাণ্ডিং আফিসারের ক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম। পার্থসারথির অনুসন্ধান করিতে, সেই ক্যাম্পের এক কর্ম্মচারী আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। সে এলাহাবাদের এক ডাক্তারের ছেলে, আমাদের পরিচিত। পার্থসারথির কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল। ডাকাতী সম্বন্ধে তাহার মুখে শুনিলাম, ডাকাতী হইয়াছে, গুলী ছুটিয়াছে, পার্থসারথি রিভলভার লইয়া ছুটাছুটিও করিয়াছে এবং লুঠও হইয়াছে—

সবাই এ কথা শুনিতেছে,—কিন্তু পার্থসারথি ছাড়া ডাকাত কেহই দেখে নাই।

আমাকে দেখিতে পাইয়াই হাবুল যদিও উল্লাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু তাহার সেই চকচকে চোখ দুইটি যেন আমার অন্তরের অভিসন্ধি এক নিমেষে পড়িয়া লইল। এমন ভাবে সে তাহার কৃতিত্বের পরিচয় দিল, ডাকাতী সম্বন্ধে তাহার বাহাদুরী এমন সতর্কতার সহিত প্রকাশ করিল, যাহাতে আমার সন্দেহ করিবার কিছুই ছিলনা। আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের বাহিরে কিছু দূর আসিয়া সে বলিয়া গেল,—"আপনার কথা আমি জীবনে কখনও ভুলবনা, ক্ষিতীশ-দা, মনে রাখবেন, আমি চিরদিনই আপনার অনুগত ছোট ভাই!"

কিন্তু পথে আসিতে আসিতে মনটা হঠাৎ বিরূপ হইয়া গেল। চির-প্রচলিত প্রবচন মনে জাগিল,—যা রটে, তা বটে! হাবুলের সম্বন্ধে লোক যাহা রটাইতেছে, তাহা কি মিথ্যা? কিন্তু যদি সত্য হয়,—চালাকি ত চিরদিন চাপা থাকেনা, যদি একদিন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন? মুরুব্বীর জোরে এলাহাবাদে যাহা সম্ভব ছিল, এখানে তাহা যে স্বপ্নেরও অতীত? পাণ হইতে চূণটুকু খসিলেই অমনি কোর্ট-মার্শাল! ব্রাহ্মণের ছেলের অদৃষ্টে শেষে এই দুর্ভোগই না উপস্থিত হয়।

হঠাৎ একদিন সচকিত হইয়া শুনিলাম, পার্থসারথির পায়া নাড়িয়াছে। কি একটা সঙ্গীন ব্যাপারে চালাকী তাহার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সাহেবের খাস তাঁবুতে পার্থসারথির উদ্দেশে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠের অশ্রাব্য গালা-গালির কিয়দংশ অনেকেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটি যে কি, কেহই তাহা অবগত হইবার অবকাশ পায় নাই। পার্থসারথিকে প্রশ্ন করিলে, সে সকলকে শুনাইয়া বলিয়াছিল,—সাহেব আমাকে ভার্দুনের ফীল্ডে পাঠাতে চান, আমি রাজী হইনি ব'লে

একবারে চটে আগুন!—কিন্তু শ্রোতারা তাহার এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। পরম্পরায় পরে প্রকাশ পাইয়াছিল, সাহেবের নিজস্ব যে তহবিল পার্থসারথির নিকট থাকিত, সেই সম্বন্ধে কোনও একটা বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া সে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।—বুঝিলাম, মনে মনে এক দিন যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই বুঝি ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ একদিন হাবুলদের ক্যাম্পের আমার সেই পরিচিত ছোকরাটি পূর্ব্ববঙ্গের এক ভদ্রলোককে লইয়া আমার আফিসে উপস্থিত। তাহাদের মুখে হাবুলের কীর্ত্তি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। সাহেবের একান্ত বিশ্বাসী এবং সাহেবের তহবিলও তাহার নিকট গচ্ছিত থাকে বলিয়া, তিনি কয় বৎসরের সঞ্চিত প্রায় পাঁচটি হাজার টাকার নোট তাহার কাছে অখণ্ডবিশ্বাসে জমা রাখিয়াছিলেন। পনের দিনের জন্য তিনি সাত মাইল দূরে আর একটি ক্যাম্পে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পর-দিনই ক্যাম্পের সকলে শুনিল, পার্থসারথিকে একটা ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়াইয়াছে এবং সামরিক বিধি অনুসারে পরবর্ত্তী জাহাজেই তাহাকে চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষে পাঠান হইতেছে। ক্যাম্পের কর্ম্মচারিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু আজ প্রাতে পূর্ব্ববঙ্গেরই সেই ভদ্রলোক পার্থসারথির তিরোধানে পাঁচ হাজার টাকার শোকে পাগলের মত হইয়াছেন, অথচ অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার মত কোনও অভিজ্ঞানই তাঁহার নাই, একখানি রসিদ পর্য্যন্ত তিনি চাহিয়া লন নাই।

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। তাহাদের বলিয়া দিলাম, "টাকা এখন দশ হাত জলের ভিতর; তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আজ সারারাত্রি ভাবিব, কাল প্রাতে দেখা করিও।"

সারারাত্রি ভাবিয়াও কোনও উপায় স্থির করিতে পারা গেল না।

তাহারই মধ্যে সত্যভূষণ বাবুর শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। দুঃখের মধ্যে হাসিও দেখা দিল। সত্যভূষণ বাবু জোর গলায় বলিয়াছিলেন, এমন ডিপার্টমেণ্টে তিনি হাবুলকে চালান ক'রে দিয়েছেন, যেখানে টাকা-পয়সার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই!—কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, টাকার দিকে যার টাঁক থাকে, শত ব্যবধানেও তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায় না! চাল আকাশের অনেক উঁচুতে উঠিলেও বন-বাদাড়ের মধ্যে ভাগাড় খুঁজিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হয় না।

পরদিন প্রাতে আমার সেই পরিচিত ছোকরাটি একাই উপস্থিত, পূর্ব্ববঙ্গের সেই হতভাগ্য ভদ্রলোকটি তাহার সঙ্গে নাই। আমাকে দেখিয়াই ছোকরা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, স্যর!

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিল,—বেচারা কাল সন্ধ্যার পর হার্ট ফেল ক'রে মারা গেছে! পাঁচ হাজার টাকার শোক সে সামলাতে পারে নি!

বল কি?—বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

চার

দীর্ঘ-প্রবাসের পর একটা লম্বা ছুটী পাইয়া কাশীতে আসিয়াছি। হাবুলের সম্বন্ধে সত্যভূষণ বাবুকে একখানা পত্র লিখিতে বসিয়াছি, এমন সময় বাবা আসিয়া বলিলেন,—সত্যভূষণ বাবুর মৃত্যু-সংবাদ তোমরা পেয়েছিলে, ক্ষিতীশ?

মহাবিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম, হাত হইতে ফাউনটেনপেনটা খসিয়া পড়িয়া গেল! শুনিলাম, মাস দুই পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

ভাবিলাম, এ দিক দিয়ে হাবুল নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু সে কোথায় গিয়া আস্তানা পাতিল ?

সেই দিন অপরাহ্ণে ভিক্টোরিয়া পার্কে বেড়াইতেছি, এমন সময় পশ্চাদ্দিক্ হইতে একখানি সুদীর্ঘ হাত আমার কাঁধটির উপর পড়িল। বিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিতেই যাঁহাকে দেখিলাম, উল্লাসে চিত্ত নাচিয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলাম, মাষ্টারমশাই—আপনি! শ্রদ্ধাভরে সেই প্রশান্তমূর্ত্তি মানুষটির পদধূলি লইয়া মাথায় দিলাম। পাঠ্যাবস্থায় আমি ছিলাম ইঁহার প্রিয়তম ছাত্র এবং ইনিও ছিলেন সকল ছাত্রেরই সুহৃদ্‌স্বরূপ ও সহরবাসী সকলেরই নিকট আখ্যা পাইয়াছিলেন—মাষ্টারমশাই। আট দশ বৎসর হইল, ইনি শিক্ষামন্দির ত্যাগ করিয়া মন্দিরময়ী নগরী কাশীধামে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং একটা বিস্তৃত বস্ত্রব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বাগানে একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া দীর্ঘকাল পরে গুরু-শিষ্যের আলাপ চলিল। আমার কর্ম্মজীবন ও তাহাতে অপ্রত্যাশিত উন্নতির কথা শুনিয়া তাঁহার কি আনন্দ! আমিও মাষ্টারমহাশয়ের ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ও দেশব্যাপী খ্যাতির কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। বহুক্ষণ কথোপকথনের পর আমরা যখন উঠি উঠি করিতেছি, সেই সময় মাষ্টার-মহাশয় সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, ভাল কথা, ক্ষিতীশ, জষ্টিস এখন পাটনায় আছেন শুনিছি, তিনি তোমাদের বিশেষ যে আত্মীয়, সে কথা আমার মনে আছে। আমার এক আত্মীয় বিজনেসসূত্রে আমার একান্ত আশ্রিত হয়ে পড়েছে, আমি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। হাজার পাঁচ ছয় টাকার মাল নিয়ে সে পাটনায় টুর করতে কালই যাবে। দেবে একখানা পরিচয়পত্র লিখে তোমাদের জজ-সাহেবের নামে?"

মাষ্টারমহাশয়ের এই অনুরোধে যেন কৃতার্থ হইয়াই বলিয়া উঠিলাম,—"স্বচ্ছন্দে ; এখনই লিখে দিচ্ছি, মাষ্টারমশাই—তোড়জোড় আমার সঙ্গেই আছে।"

ইদানীং কবিতা-রোগ আমাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। তাই অপরাহ্ণ ভ্রমণে বাহির হইবার সময় রাইটিং প্যাডটি সখীর মতই সঙ্গে থাকিত।

পত্রে ভণিতা আরম্ভ করিয়াই, কলমটি তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"হাঁ, পত্রবাহক অর্থাৎ আপনার সেই আত্মীয়টির নাম—"

মাষ্টারমহাশয়ের হাস্যময় মুখখানির ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট উচ্চারিত হইল,—"পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী।"

আমার মনে হইল, রাইটিং প্যাডের মোটা কাগজখানার উপর লেখা প্রথম ছত্রটির কালো কালো অক্ষরগুলি একটা অজগর সর্পের আকার ধরিয়া আমাকে একবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে! মাষ্টারমহাশয়ের স্নেহার্দ্রস্বর আমার সেই অভিভূত অবস্থাটা কাটাইয়া দিল। তিনি বলিলেন—"কি হ'ল, ক্ষিতীশ! অসুখ কিছু করল না ত?"

আপনাকে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া, মনের তাৎকালীন অবস্থাসূত্রে একটু কঠিন স্বরেই প্রশ্ন তুলিলাম—"এই পার্থসারথি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, মাষ্টারমশাই?"

মাষ্টারমহাশয় অবিচলিতসুরে বলিলেন, "আমার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ; তুমি একে জান না কি, ক্ষিতীশ?"

"আচ্ছা বলুন ত,—এই লোকটার মামার বাড়ী কি মূলাজোড়ে নয়?"

"হাঁ,—আমার শ্বশুরবাড়ীও যে মূলাজোড়ে, ক্ষিতীশ।"

"এলাহাবাদে সত্যভূষণ বাবুর আশ্রয়ে এ থাকত, এ খবর আপনি জানেন?"

"শুনেছি।"

"মেসোপটেমিয়ায় চাকরী করতে যায়, এক বছর হবে, সেখান থেকে ফিরে এসেছে,—নয় কি ?"

"হাঁ।—যা কিছু উপায় করেছিল, সবই খুইয়েছে। ছোকরা খুব চালাক, বিজনেসের সুলুক-সন্ধান দিয়ে ওকে যদি তৈরী ক'রে নিতে পারি—"

"আপনি ওর বিরুদ্ধে কিছু শুনেছেন ? যদি না শুনে থাকেন, আমি এমন কয়েকটা কথা আপনাকে শোনাতে পারি, যা অপ্রিয় হলেও অতি সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ, এবং সে কথাগুলি শুনলে আপনি ওকে কালসাপের মত সভয়ে ত্যাগ করবেন। শুনতে চান ?"

মাষ্টারমহাশয়ের সদাপ্রসন্ন মুখখানা যেন সহসা অন্ধকারময় হইয়া গেল এবং সেই আঁধার ভেদ করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দৃপ্তস্বরে তিনি উত্তর দিলেন,—"না !—সে আমার আত্মীয়, শরণাপন্ন ; আমি তাকে সাহায্য করব ব'লে কথা দিয়েছি। তার বিরুদ্ধে কোনও কথাই আমি এখন শুনতে চাই না। সে যে কি, তা আমি জানতে চাই না ; আমি কি, বরং এ কথাই তাকে জানাতে চাই। আমি বুঝতে পেরেছি, ক্ষিতীশ, ওর সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভাল নয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তোমার উচিত নয় এই পরিচয়-পত্র তাকে দেওয়া। থাক্, ও পত্র আর শেষ ক'রে কায নেই।"

অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া গাঢ়স্বরে আমি বলিলাম,—"তা হবে না মাষ্টার-মশাই, এ পত্র আমি শেষ করবই। এ দিক দিয়ে যে আমার সংশয়, এ কথা আপনি ভুলেও মনে করবেন না। আমার ভয়, পাছে আপনার অত টাকার মালের অপচয় হয়।"

মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"মালগুলো নিয়ে সত্যিই যদি সে গা-

ঢাকা দেয়, ক্ষিতীশ, এই সামান্য টাকার জন্য আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না ; কিন্তু সে যদি এর ওপর নির্ভর ক'রে মানুষ হবার একটা উপায় পায়, সেইটিই যে আমার পক্ষে হবে মস্ত বড় সান্ত্বনা।"

চিঠিখানা শেষ করিয়া মাষ্টারমহাশয়ের হাতে দিলাম। বাগানের বাহিরে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে ছাড়িলেন না, বাসার কাছে নামাইয়া দিয়া গেলেন এবং যাবার সময় অনুরোধ করিয়া গেলেন, আমি যেন এক দিন তাঁহার আফিস দেখিতে যাই।

দীর্ঘকালব্যাপী অর্থশাস্ত্রের পরিচর্য্যার'ফলে, অর্থনীতি সম্বন্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রভাবে মাষ্টারমহাশয়ের বিজনেস না।দেখিয়াই সে দিন মনের এই অনুমানটুকুই সহজভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সহৃদয় ও সরল বিশ্বাসী মাষ্টারমহাশয় অর্থনীতিকে উপেক্ষা করিয়াই নিজের খেয়ালমত তাঁহার বিজনেস চালাইতেছেন। নতুবা, পাঁচ হাজার টাকার মালকে সামান্য বলিয়া এ ভাবে উপেক্ষা করা কোনও অর্থবিদ্ ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাযেই তাঁহার বিজনেসটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার একটা প্রলোভন স্বতঃই মনে জাগিতেছিল।

পরদিনই তাঁহার আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সত্যই একটা বড় রকমের কারবার। চারিদিকে লোকজনের সমাবেশ, সারি সারি অনেকগুলি টেবল ; আগাগোড়া টানা-পাখা চলিয়াছে ; কর্ম্মচারীদের মধ্যে আমার পরিচিতও কয়েক জনকে দেখিলাম। যেন একটা ছোটো-খাটো সওদাগরী আফিস। চারিদিকেই যেন কমলার পদচ্ছায়া পড়িয়াছে। মাষ্টারমহাশয়ের নিজের হাতে গড়া কার্য্যালয়টি দেখিয়া সত্যই মনে বড় আনন্দ হইল।

মাষ্টারমহাশয়ের নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চা ও জলখাবার উপস্থিত। সেগুলির

সদ্ব্যবহার না করা পর্য্যন্ত তিনি কোনও কথা কহিবেন না জানাইয়া দিলেন। কাযেই তাঁহার মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রেই রক্ষা করিতে হইল। অন্যান্য কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক কথা কথার-পিঠে উঠিবার পর, বিজনেসের কথা উঠিল। সেই সূত্রে আমি বলিলাম, আপনার আফিসে লোকজনের যে রকম ছটা দেখে এলুম, মাষ্টারমশাই, তাতে মনে হয়, "আফিসের এসটাব্লিসমেণ্ট খরচ বড় ছোটখাটো ব্যাপার নয়। আচ্ছা বলুন ত, এ বিজনেসের আয়টা কি রকম ?"

মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আমিও ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলুম, ক্ষিতীশ,—তোমার মত ঝুনো অর্থবিদ সহজে আমাকে রেহাই দেবে না। তা দেখ বাবা, সত্য কথা বলতে কি—আয়-ব্যয়ের হিসেব বড় একটা বুঝি না; রোজকার খবর এইটুকুমাত্র রাখি,—কত এলো, আর কত গেল; তাতে সমান সমানই থাকে, ফাজিল বড় একটা হয় না।"

কথাটা শুনিয়া একটু চমৎকৃত হইয়াই বলিলাম,—"এ ত বড় অদ্ভুত হিসাব, মাষ্টারমশাই! আচ্ছা বলুন ত, রোজ কত আপনার আসে ?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—"তা গড়ে হাজারখানেক টাকা হবে।"

আমি বলিলাম,—"আপনি ভালবাসেন, আর ছেলেবেলা থেকে আপনার ওপর একটা জোর আছে বলেই আমি এ সব অনধিকারচর্চ্চা করছি, মাষ্টারমশাই। কিন্তু আপনার যে আমদানীর কথা বললেন, কাশীর মত যায়গায় এমন একটা কারবারের পক্ষে সেটা অবহেলা করবার মত নয়; কিন্তু আফিসে আপনার যে বিরাট ষ্টাফ দেখছিলুম, সেটা যেন এর তুলনায় নিতান্ত বেশী মনে হয়। এই ষ্টাফে এমন একটা মার্চ্চেণ্ট আফিস চালান সম্ভব, যেখানে নিত্য লাখ্ টাকার কায হয়। সিকি লোক রেখে বাকি সমস্ত লোক আপনার ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বলেন ত, এ বিষয়ে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে সাহায্য করতে পারি।"

প্রস্তাবটা শুনিবামাত্রই মাষ্টারমহাশয়ের প্রসন্ন মুখখানি মলিন হইয়া গেল, তাহা লক্ষ্য করিলাম। তিনি মুহূর্ত্ত কয়েক কি ভাবিয়া সহসা সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—"তুমি যা বলেছ ক্ষিতীশ, তা মিথ্যে নয়। আমিও এ কথা অস্বীকার করি না। নিজের হাতে এই বিজনেস আমি গ'ড়ে তুলেছি। প্রথম প্রথম মাদুর পেতে আফিস পত্তন করেছিলুম, সেকথাও ভুলি নি। আর এখনও এ স্পর্দ্ধা আমি রাখি যে, দুটো মাত্র সহকারী নিয়ে এ আফিস চালাবার সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু বাবা, সত্য কথা বলতে কি, সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এ কারবারের ত ভিত তৈরী করি নি। তুমি বোধ হয় শুনে থাকবে, এক শ্রেণীর সাধু আছেন, তাঁরা সোনা তৈরী করতে পারেন। কিন্তু আবশ্যক যজ্ঞ ও সেই সূত্রে সাধুসজ্জনের সেবার জন্যই তাঁরা সে কায করেন,—নিজেদের উদরপূরণের জন্যও নয়। তেমনই আমার মনেও এই ধারণা যে, বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে মানুষ আসে মুক্তির জন্য, সেখানে বিজনেস ক'রে বিত্ত-সঞ্চয় অনুচিত, আমি তাই বিজনেসকে নিজের ও আর দশ জনের অন্নসংস্থানের অবলম্বন বলেই অবলম্বন করেছি। তাই এর লাভলোকসানের হিসেব রাখি না,হাজাশুকোর সন্ধান করি না; সকলকে দিয়ে থুয়ে যা পাই, তাই নিজে খাই। ভরসা এইটুকু আছে, যিনি সত্যকার মালিক, তিনিই যুগিয়ে যাবেন। প্রত্যেকেই আমরা এই কারবারটির সেবক।"

এ কথার উত্তর কি দিব? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। হঠাৎ বাহিরে রাস্তার উপর প্রস্তুত মাষ্টারমহাশয়ের সুন্দর গাড়ীখানির উপর দৃষ্টি পড়িল। একটা যেন সূত্র পাইয়া বলিলাম,—"তবে গাড়ীঘোড়া রেখেছেন কেন?"

মাষ্টারমহাশয় এবার উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর দিলেন,—"এ জেরাটা কিন্তু বড়ই বেখাপ্পা শুনালো, ক্ষিতীশ! তবুও উত্তর দিচ্ছি শোন,—এও যে

কারবারের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হে। এই গাড়ীটিকে আশ্রয় করেও দু তিনটি প্রাণী অন্নসংস্থান করছে না? আর, এও বলি, গাড়ী করেছি, কিন্তু বাড়ী করি নি।"

বুঝিলাম, মাষ্টারমহাশয়ের সহিত তর্ক করা বৃথা। তিনি অর্থনীতি-সঙ্গত পথটির ধার দিয়াও যাইতে চাহেন না,—নিজেরই উদ্ভাবিত একটা অপরিচিত রাস্তার উপর দিয়া তিনি তাঁহার মানস-রথটি চালাইয়া চলিয়াছেন। হয় ত, এই পথেই তিনি তাঁহার কাম্যবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। এই সময় সহসা হাবুলের কথা মনে জাগিয়া উঠিতেই নিজের অজ্ঞাতেই যেন এই প্রশ্ন উঠিল—"কিন্তু হাবুল যদি এই রথের সারথি হইয়া বসে,—তখন?"

আশ্চর্য্য,—চোখ তুলিয়া দেখি, সম্মুখেই হাবুল! আমাকে দেখিয়াই সেও আমারই মত আশ্চর্য্যান্বিত! জলের উপর সাপ খেলা করিলে, সে দৃশ্য যেমন ভয়াবহ অথচ নেত্রসুখকর হয়, হাবুলের চকচকে দুইটি চক্ষুও আমার চক্ষুর উপর সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল। শুষ্ক-কণ্ঠে হাবুল বলিল,—"ও! ক্ষিতীশ দা! প্রথমটা ঠিক চিনতে পারিনি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে নত হইয়া আগে মাষ্টারমহাশয়ের পদধূলি লইল। আমার পায়ে যদিও জুতা ছিল, তাহারই তলায় হাত বুলাইয়া সে আজ আমারও সম্মান রক্ষা করিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—"তোমার মাল সব লিষ্ট ক'রে নিয়েছ ত?"

হাবুল পীনে আঁটা কয়েক সীট কাগজ মাষ্টারমহাশয়ের হাতে দিয়া বলিল,—"এতে সমস্ত কাপড়ের নম্বর, নাম ও দাম টুকে আমি দস্তখৎ ক'রে দিয়েছি।"

মাষ্টারমহাশয় লিষ্টখানা খুলিয়াও দেখিলেন না, টেবলের ড্রয়ার টানিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দিলেন। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, হাবুলের স্বাভাবিক

চকচকে চোখ দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, বুদ্ধির ভুলে মাষ্টার-মহাশয় এই অসাধারণ চক্ষুষ্মানের চক্ষুর উপর তাঁহার অফুরন্ত বিশ্বাস-রত্ন-পূর্ণ চিত্তের দ্বারটি যেন খুলিয়া দিলেন!

জমকালো উর্দ্দী ও কোষবদ্ধ তরবারিধারী এক বলিষ্ঠ মুসলমান চাপরাসী কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া সেলাম বাজাইয়া বলিল,—"সমস্ত তৈরী।"

শুনিলাম, সে ব্যক্তিও হাবুলের সঙ্গে টুরে যাইবে। বাহ্য আদপ-কায়দার দিকে মাষ্টারমহাশয়ের সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব নাই,—অভাব শুধু বিজনেসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ও আয়ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিদানের।

মাষ্টারমহাশয়ের সমক্ষে হাবুলকে কোনও প্রশ্ন করাই আমি কর্ত্তব্য মনে করি নাই। বাহিরে আসিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কসৌলী থেকে ফিরলে কবে? বিষ-টিষ আর নেই ত!"

হাবুল বেহায়ার মত দন্তপাটি বিকাশ করিয়া বলিল,—"আপনিও যেমন ক্ষিতীশ-দা! মরুভূমিতে আর কত দিন মন টেঁকে বলুন; ছুটী নেবার ও একটা মস্ত ছল বৈ ত নয়!"

"তা হ'তে পারে। কিন্তু তুমি চ'লে আসবার পরেই পূর্ব্ববঙ্গের সেই ভদ্রলোকটি তোমাকে ত খুঁজে অস্থির।"

"কত ভদ্রলোকের সঙ্গেই যে আলাপ, কার খোঁজ আমি রাখব বলুন।"

"আমি যে ভদ্রলোকটির কথা বলছি, তাঁর সঙ্গে তোমার এমন কিছু আর্থিক ব্যাপার—"

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়াই হাবুল বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ও-হো—তাই বলুন—সে বাঙ্গালটা! গোটা কতক টাকা আমার কাছে রেখেছিল। আসবার দিন তাকে খুঁজে খুঁজে নাকাল, সে ইষ্টার্ণ ক্যাম্পে গেছে শেষে সাহেবের কাছেই টাকা ক'টা রেখে আসি। ব্যাটা বুঝি; সেই গোটাকয়েক টাকার জন্যে—"

"না হে—তোমার কাছে গচ্ছিত সেই গোটা কয়েক টাকার শোকে সে হতভাগাটা সেই রাত্রিতে হার্টফেল করে মরেছে।"

হাবুল আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার সে সময়কার চাহিবার ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে সংঘটিত একটা খুনী আসামীর মুখখানা মনে পড়িয়া গেল। সে যখন প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পায় অপ্রত্যাশিতভাবে, সে সময় তাহার মুখভঙ্গী আমি দেখিয়াছিলাম। হাবুলের মুখেও আজ যেন তাহারই প্রতিচ্ছায়া দেখিলাম।

দিন দশেক পরে মাষ্টারমহাশয়ের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইল। তিনি নিজেই বলিলেন,—"জজসাহেব তোমার চিঠির যথেষ্ট সম্মান করেছেন। হাবুলের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাযের দিক দিয়ে কি হ'ল, মাষ্টারমশাই?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"তা মন্দ কি! ছোকরার ক্ষমতা আছে ক্ষিতীশ; আমি দিয়েছিলুম হাজার সাতেক টাকার মাল, অর্দ্ধেক বেচে এসেছে। আর নতুন অর্ডারও এনেছে দু'তিন হাজারের।"

"তছরূপ কিছু হয় নি ত?"

মাষ্টারমহাশয় মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"বিশেষ তেমন নয়, খান দুই বেনারসী চুরি হয়ে গেছে। ওর ধারণা চাকরদের কায, কিন্তু এই নিয়ে যে একটা সিনক্রিয়েট করে নি, এতে আমি এত খুসী হয়েছি যে, ও লোকসানটা লাভ বলেই ধ'রে নিয়েছি!"

ভাবিয়া স্তব্ধ হইলাম মাত্র!

পাঁচ

আফিসের ঝঞ্ঝাটে পূরা সাতটি মাস কাশীর দিকে আসিতে পারি নাই বা মাষ্টারমহাশয় ও হাবুলের কোনও সংবাদও আর পাই নাই। সে দিন বাহিরের ঘরে বসিয়া আফিসেরই একটা ফাইল দেখিতেছি, এমন সময় একখানা ইনভয়েস কার্ড পাইলাম! কার্ডখানা আমার স্ত্রীর নামেই আসিয়াছিল! ভিঃ পিঃতে কাপড় ও কেতাব আনানো, তাঁহার একটা উঁচু রকমের সখ! এবার কোন দুর্লভ বস্তুটির অগ্রদূতরূপে কার্ডখানা উপস্থিত, তাহার পরিচয় লইতে গিয়াই, প্রেরকের চিরপরিচিত নামটি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! কি সর্ব্বনাশ! এখানেও সেই পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী!

তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ডাকিয়া কার্ডখানা দেখাইলাম। তিনি পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন,—"বড় আশ্চর্য্য ত! যে নামের শাড়ী আমি চেয়েছিলেম, ঠিক সেই নামের ও সেই দামের শাড়ীই পাঠিয়েছে দেখ্‌ছি; কিন্তু যাঁকে পাঠাতে লিখেছিলেম, এ ত সে লোক নয়?"

একটু পরিহাসের সুরেই প্রশ্ন করিলাম,—"কি সর্ব্বনাশ! অর্ডার দিয়েও এমন অদল-বদলও হয় না কি? কার উদ্দেশে আদেশটি নিয়েছিলে শুনি?"

ঝঙ্কার দিয়া স্ত্রী আমার রসিকতার উত্তর দিলেন,—"আহা-হা, যেন ন্যাকা—জানেন না কিছু! তোমার মাষ্টারমহাশয় ছাড়া আর কারুর কাছে কাপড়ের অর্ডার কখনও দিয়েছি না কি?"

মনটা একবারে মুসড়াইয়া গেল। আফিসের ফাইলের উপর মাষ্টার-মহাশয়ের কাশীর সেই আফিস, সেই বিরাট ব্যাপার এবং সঙ্গে সঙ্গে

হাবুলের সেই অদ্ভুত মুখভঙ্গী ভাসিয়া উঠিল। কাশীতে যাইবার জন্য মনটা একেবারেই চঞ্চল হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাতের কাযগুলি শেষ করিয়া দিয়া সেই দিনই এক সপ্তাহের ছুটীর জন্য আবেদন করিলাম।

বাবার কাছে মাষ্টারমহাশয়ের দৈহিক ও বৈষয়িক অবস্থার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। যে আশঙ্কা একদিন করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই হুবহু হইয়া পড়িয়াছে। হাবুল ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্য্যে মাষ্টারমহাশয়ের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে এবং আস্তে আস্তে সমগ্র কারবারটির উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তাহার সৌভাগ্যক্রমে মাষ্টারমহাশয় সহসা স্নায়ু-সংক্রান্ত এমন এক ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার গৃহ-চিকিৎসক শৈলেন বাবু সমস্ত কাযকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ তিনটি মাস তাঁহার পল্লীভবনে নির্জ্জন অবস্থিতির পরামর্শ দেন। পূর্ণ তিনটি সপ্তাহ তিনি একপ্রকার অজ্ঞান অবস্থাতেই শয্যাশায়ী ছিলেন। শৈলেন বাবুর কঠোর শাসনে তাঁহার সহিত কাহারও কথা কহিবার অধিকার ছিল না। হাবুল কিন্তু সকল বিষয়ের মধ্যেও স্বকার্য্য উদ্ধারে কিছুমাত্র অবহেলা করে নাই। মুমূর্ষু অবস্থায় মাষ্টারমহাশয় যখন সপরিবারে বঙ্গের পল্লীর উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন হাবুল সুকৌশলেই তাঁহার নিকট হইতে কারবার পরিচালনা সম্বন্ধে একাধিপত্যের অধিকারটুকু আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং তাঁহার প্রস্থানের পরেই, সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া তাহার স্বার্থ সিদ্ধির পথ মুক্ত করিয়া লইয়াছিল।

দিন দুই পরেই শুনিলাম, মাষ্টারমহাশয় সুস্থ হইয়া ফিরিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়াই মনটা আনন্দে ভরিয়া গেল। স্নানাহার ভুলিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম।

সেই বাড়ী—সেই স্থান; কিন্তু সেই সমারোহের আজ কোন চিহ্ন

নাই। নানা শ্রেণীর লোকের অবিশ্রান্ত যাতায়াত—বহুজনের উপস্থিতিজনিত একটা মধুর গুঞ্জন যে বাড়ীর শোভা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তাহা শ্রীহীন।

সেই ঘরখানিতে ঢুকিতেই মাষ্টারমহাশয় ব্যগ্রউল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষিতীশ যে, এসো, এসো ;—ওরে,কে আছিস—চা আন, খাবার আন।"

দুঃখের মধ্যেও হাসি আসিল, আজও মাষ্টারমহাশয়ের সেই আদর—সেই আপ্যায়ন. শুধু মৌখিক নয়—ব্যয় করিয়া তাহা ব্যক্ত করা চাই-ই।

কার সাধ্য তাঁহার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে। জলযোগে পরিতৃপ্ত হইতেই হইল। আয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা কম নয় ; বরং বেশী !

মাষ্টারমহাশয় একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমি বুঝতে পারছি, ক্ষিতীশ, তুমি অনেক কিছু অনুযোগ করবে বলেই তৈরী হয়ে এসেছ। তাই আমি আগে থাকতেই সাফাই গাইছি। প্রথমেই তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি, অদৃষ্ট মান ত ?"

তর্ক তুলিবার ইচ্ছা ছিল না মোটেই, অবস্থাটা শুনাই ছিল একান্ত আগ্রহ। উত্তর দিলাম,—"তা মানি বৈ কি।"

মাষ্টারমহাশয় অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—"এও তাই। দেখ ক্ষিতীশ, মাষ্টারী করেও মর্য্যাদা বা পয়সা কম পাই নি। অদৃষ্ট আনলে সে পথ থেকে টেনে। খেলার ছলে একটা ঢেলা ছুড়েছিলুম, সেই হ'ল একটা ছোট-খাটো পাহাড় ; সবাই দেখে অবাক্ ; বলে, মাষ্টারের কি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ! আজ সেই অদৃষ্টই আবার ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙতে সুরু করেছে, পাথরগুলো ছিট্‌কে ছুটে চলেছে ! লোকে বলছে,—মাষ্টার লোকটা কি বেকুব—কত বড় বেহিসেবী ?—আমি শুনি আর হাসি। মনে মনে ভাবি, কেউ একবার এ কথাটা ভুলেও বলে না—দোষ মাষ্টারেরও নয়, হাবুলেরও নয়,—সবই বিধিলিপি।"

মাষ্টারমহাশয়ের কথাগুলি সত্যিই আমার মত অবিশ্বাসী তার্কিকের মনেও এমন একটা ঝঙ্কার তুলিল, আমি কিছুক্ষণ অভিভূতের মত চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর সেই আশ্চর্য্য মানুষটির সেই সদাপ্রসন্ন মুখখানির দিকে চাহিয়া শুধু এই প্রশ্ন করিলাম,—"আগেকার অবস্থার সঙ্গে এখনকার অবস্থা মনে উঠে আপনাকে কি কিছুমাত্র বিচলিত করে না ?"

মাষ্টারমহাশয় সহজস্বরে বলিলেন,—"না ক্ষিতীশ, আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আমি একটুও বিচলিত নই। এ রকম যে হবে, আমি জানতুম। আর এ ত সবে সন্ধ্যা দেখছ, গভীর রাত্রি আছে ; সে-ও তোড়জোড় বেঁধে আসছে। ভুগতে হবেই। অদৃষ্টের ভোগ ঠেকাবে কে ? কিন্তু আমি তার জন্য প্রস্তুত। আবার এ বিশ্বাসও আমার আছে, এ দুর্য্যোগ কেটে গেলে, আবার আলো দেখা দেবে। হাঁ, তবে একটা যে আমাকে মাঝে মাঝে ব্যথা দিচ্ছে, তা অস্বীকার করব না। হাবুলের ওপর আমার এইমাত্র অভিযোগ,—সে এতগুলো লোকের অন্নে আঘাত করেছে। আমি এইটেই বরদাস্ত করতে পারছি না কিছুতেই। আমি হচ্ছি সেই লোক, ক্ষিতীশ—মহাসমুদ্রের মাঝে মহা ঝঞ্ঝা মাথায় ক'রে যে মজ্জমান জাহাজের ওপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,—নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় না, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ডুবতে চায়। হাবুল আমার এ সাধে বাদ সেধেছে, এ কথা আমি একশ বার বলব।"

বদ্ধদৃষ্টিতে মাষ্টারমহাশয়ের সেই দৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল, সত্যই, নিজের হাতে যিনি একটা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে তুলেন, তার পতনে আমরা শুধু তাঁহার অক্ষমতাই স্মরণ করি ; সেই স্রষ্টার অন্তরটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাই না।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হাবুল এখন কোথায় ?"

মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"কোথায় আর যাবে বল ?

এখানেই আছে। তুমি আসবার মিনিট কতক আগেই ত উঠে গেল। ও বেচারার জন্যেও কষ্ট হয়। আমিও গেলুম,—ও ছোকরাও কিছু ক'রে উঠতে পারলে না।"

কথা তাঁর শেষ হইতেই দেখি, পোষ্ট আফিসের জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী হাবুলের হাতটি ধরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাষ্টার মহাশয় সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—"আরে বাকচা যে, এসো এসো, ব'স। ওরে—কে আছিস্—বাকচীমশায়ের জন্যে চা আর খাবার—"

বাধা দিয়া বাকচীমহাশয় বলিলেন,—"মাপ করুন মাষ্টারমশাই, ও-সব আর এক দিন হবে, আজ নয়; আমি এসেছি একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে—"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন,—"তাই না কি! তা' হাবুলকে কোথা থেকে ধরে' আনলে আবার? বেচারী বাড়ী যাচ্ছিল—বেলাও হয়েছে অনেকটা—"

বাকচীমহাশয় বলিলেন,—"এই বেচারীকে নিয়েই যে আমার কায! পথে দেখা, আসতে কি চান সহজে, কত রোক; শেষে পুলিসকেসের কথা তুলতে তবে কোনমতে আস্তে রাজি হলেন।"

মাষ্টারমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

বাকচীমহাশয় বলিলেন,—"আর মশাই, আপনারা দেখছি আমাদের চাকরী না খেয়ে ছাড়বেন না। আপনি এঁর ওপর অথরিটি দিয়ে চ'লে গেলেন, ইনি এখন নিজেই প্রোপ্রাইটার হয়ে যে সব কীর্ত্তি করেছেন, তার খবর রাখেন কিছু?"

আমরা উভয়েই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাকচীমহাশয়ের দিকে চাহিলাম। তিনি ফাইল ঘাঁটিয়া যাহা হাতে কলমে দেখাইলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী মাষ্টারমহাশয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাঁহার ফারমের চিঠি-পত্র নিজের বাসাতে ডেলিভারী লইয়া আসিতেছেন এবং তৎসংক্রান্ত

মালপত্রও স্বয়ং সরবরাহ করিতেছেন। পোষ্টাফিসে গ্রাহকপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায়, গোপন তদন্তে প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই ব্যাপারের মীমাংসা করা বা পার্থসারথিকে জেলে দেওয়া মাষ্টারমহাশয়ের সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে।

আমিও আর রাগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার স্ত্রীর নামে লিখিত ইনভয়েস পত্রখানিও বাকচীমহাশয়ের হাতে দিয়া, তাঁহার ফাইলের অভিযোগগুলির আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিলাম।

জেলের কথা তুলিতেই, হাবুল তাহার চকচকে চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক রকমে চিক্কণ করিয়া বলিল, "থামুননা মশাই, জেলে এমন সবাই দেয়! পোষ্টাফিসের ইন্‌সপেকটারী করতে করতে পুলিসের দারোগাগিরিও চলে না কি?"

বাকচী তাঁহার হাতের ফাইল-বুকটা টেবলের উপর আছড়াইয়া বলিলেন,—"রাসকেল, তুমি ঠাওরেছ কি? এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি তোমার হাতে হ্যাণ্ডকাপ না পরাতে পারি, তা হ'লে আমি বারেন্দ্র-বাচ্ছা নই। জানো, তুমি যে সব কীর্ত্তি করেছ, তা পুলিস-চালানী কেস্—এর জন্যে মাষ্টারমহাশয়কে পুলিসকোর্টে ছুটতে হবে না।"

ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার আসিয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টারমহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বাকচীমহাশয় এড়াইতে পারিলেননা। তাঁহার উদগ্র রোষানল একটু প্রশমিত হইতেই, মাষ্টারমহাশয় বলিলেন,—"জান ত ভাই বাকচী, আমি কোর্টের ধারেও কোনওদিন যাইনি। এই একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি আমাকে আদালত-ঘর করাতে চাও? আমি বলছি ভাই আমার কোনও অভিযোগ নেই। বুঝছি আমি, হাবুল কত দূর অন্যায় করেছে—কত বড় বিশ্বাসঘাতক সে। আর এ ও জানছি—এ

অপরাধের কি শাস্তি। কিন্তু তবুও, ওর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে যা লিখে দিতে হবে বল, আমি প্রস্তুত।"

বাক্‌চীমহাশয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া মাষ্টারমহাশয়ের মুখটির উপর চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"একটি অনুরোধ করছি, মাষ্টার-মশাই! ব্যবসা আর করবেননা। যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

পার্থসারথির অনুকূলে মাষ্টারমহাশয়ের স্বীকারোক্তি লিখাইয়া লইয়া বাকচীমহাশয় চলিয়া গেলেন। আমিও উঠিয়া পড়িলাম।

কক্ষের বাহিরে আসিতেই মাষ্টারমহাশয় তখন হাবুলকে বলিতে-ছিলেন,—"আর ত আমাদের সংযোগ থাকতে পারেনা, হাবুল! আশা করি, তুমিও আর অনুরোধ কিছু করবেনা। এখন আমার কথা এই, অসুখের সময় সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলুম। তার কোনও হিসেব-নিকেশ নেই। অবশ্য হিসেব একজন ঠিক রেখেছেন, কিন্তু তুমি তাঁকে মান কিনা, জানি না। যাই হোক, নিজের বাসায় এখান থেকে যে সব মাল নিয়ে গিয়ে রেখেছ, তার অবশিষ্ট যা কিছু আছে, ইচ্ছে হয় দিয়ে যেও। যদি না দাও, আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তোমার বোঝা এত ভারি হয়ে উঠবে যে, সেই অদৃশ্য হিসাবরক্ষক তা সহ্য করবেননা।"

দেখিলাম, হাবুল নিরুত্তরেই বাহির হইয়া আসিতেছে।

ছয়

মাস কয়েকের মধ্যে কর্ম্মস্থলে বসিয়াই পার্থসারথির বস্ত্রব্যবসায়ের অসামান্য প্রতিষ্ঠার কথা শুনিলাম। কিন্তু কিছুমাত্র চমৎকৃত হইলাম না। প্রায়ই সংবাদ পাই, এলাহাবাদে প্রতি সপ্তাহেই সে মালপত্র লইয়া আসে, কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ কোনও দিনই হয় নাই।

আফিস হইতে ফিরিয়া বাবার একখানি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, পাটনার জজ সাহেবের কন্যার বিবাহ; আত্মীয়তাসূত্রে আমাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে। পরদিন হইতেই মহরমের ছুটী। রাত্রিতেই কাশী রওয়ানা হইলাম।

অহল্যাবাঈএর ঘাটে স্নান করিতে নামিয়াই, হাবুলের সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত আলোচনা শুনিতে পাইলাম।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তি বলিতেছিলেন,—"পার্থসারথির রথ বুঝি এবার উল্টোয়!"

আর একজন উত্তর দিলেন,—"সে ত জানা কথাই; মাষ্টারমশায়ের দীর্ঘনিশ্বাস কি মিথ্যে হবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হয়েছে মশাই পার্থসারথির?"

উত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহা এই যে,—একটা বড় রকমের অর্ডার পাইয়া হাবুল মদনপুরা ও আলাইপুরার কারিগরদের খবর দেয়। অনেকেই জাঁকোড়ে তাহার দোকানে মাল দিয়া যায়। ইহা গত রাত্রির কথা। আজ প্রাতে খবর পাওয়া যায়, দোকানের দরজার একখানা তক্তা খুলিয়া চোরে সব মাল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। দোকান একবারে খালি।

দোকানদার-গোছের একটি তরুণ যুবা কথাগুলি শুনিতেছিল। সে

হাসিয়া বলিল,—"হাবুল সেই ছেলেই বটে ; আপনারাও যেমন ! ও সাত চোরের পকেট মেরে বেড়ায়, চোর করবে ওর দোকানে চুরি ! দারোগা দেখেই ব'লে গেল, এই এক বিঘত তক্তাখানা সরিয়ে চোর কি ক'রে অত কাপড় চুরি করলে মশাই ? কিন্তু হাবুল কি দমবার ছেলে ? বললে,— কাপড়গুলো এই ফাঁকটুকুর ভেতর দিয়ে টেনে বার করেছে, মশাই ! দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন,—আলমারির চাবি কি ক'রে খুললে তা হ'লে ? হাবুল বললে,—কেন, মাল ত কাল আলমারির ভেতর তোলা হয়নি একখানিও ; টুরে যাব ব'লে ভেতরেই থাক্ দিয়ে রাখা ছিল। তার পর তার কান্না। দারোগা রিপোর্ট লিখতে পথ পেলেনা। কিন্তু মশাই, এই ষোলো আনাই ভূয়ো ! চুরিও হয়নি, মালও যায়নি, সব ঠিক আছে, মাঝ থেকে কারিগর মিঞারাই মারা যাবে—এই যা বুঝিছি।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছোকরা তার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঢের ঢের দোকানদার দেখিছি বাবা, কিন্তু এমনটি আর দেখলুমনা। রাহি-ভদ্দর লোকদের মন্দিরে যাবার যো নেই, জামা ধ'রে টানে,—বলে, দেখে ত যান ! পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে বলে, এইখানে রেখে যান, নইলে হারিয়ে যাবে। মেয়েরা দোকানের পাশ দিয়ে গেলেই হাত যোড় ক'রে বলে,—মা গো, তোমার কাশীর ছেলে, খেতে দিও মা ! বলুন ত মশাই, এমন যে তুখোড় দোকানদার, তার দোকান থেকে এ রকম ক'রে চুরি হ'তে পারে ? সেটা সম্ভব কখনও ?"

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে হাবুলের এ কীর্ত্তিও শুনিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে যতই অসম্ভব রকমের অভিযোগ উঠ্‌কনা কেন, আমার বুঝি অবিশ্বাস করিবার মত সামর্থ্যটুকুও ছিল না।

সেইদিনই পাটনায় যাত্রা করিলাম। আত্মীয় জজসাহেবের সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়াই সবিস্ময়ে দেখিলাম,—একখানা অতিকায়

টেবলের উপর রাশীকৃত মূল্যবান্ বেনারসী বস্ত্ররাজি রক্ষিত এবং দুধরঙের একখানি বেনারসীর প্রশস্ত আঁচলখানি খুলিয়া হাবুল তাহার তারিফ করিতেছে।

আমার অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গে হাবুলের হাতের শাড়ীখানির রঙের সহিত তাহার মুখের রঙটিও বুঝি মিশিয়া গেল। তবুও শুষ্ককণ্ঠে সে বলিতে ভুলে নাই,—"এই যে, ক্ষিতীশ-দা যে, আসুন, আসুন ;—আপনার অনুগ্রহেই আমি এ-বাড়ীর পথ চিনেছি।"

আমি কোনও উত্তর না দিয়াই বাড়ীর ভিতরে সটান চলিয়া গেলাম।

*   *   *   *   *

ফিরিবার দিন ষ্টেশনে আবার হাবুলের সহিত সাক্ষাৎ। অনেকগুলি কাপড় বিক্রয় করিয়া মোটা অঙ্কের একখানি চেক লইয়া সে কাশী ফিরিতেছিল।

প্রশ্ন করিলাম,—"চুরির কি কিনারা হ'ল হাবুল ?"

হাবুলের মনটা সেদিন খুবই প্রসন্ন ; ডজনখানেক মগাই পাণ মুখের ভিতর পূরিয়া সে তখন তাহাদের জব্দ করিতে ব্যস্ত ছিল। সেই অবস্থাতেই ব্যগ্রভাবে উত্তর দিল,—"কিনারা আর কি হবে, ক্ষিতীশবাবু, আমাকেই টাকাগুলো গচ্চা দিতে হবে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখবিবরনিঃসৃত পাণের চর্ব্বিত চূর্ণগুলি আমার গায়ের রেশমী জামাটি শত চিহ্নিত করিয়া দিল। সভয়ে সরিয়া আসিলাম।

কিন্তু হাবুল আমাকে আজ ছাড়িতে নারাজ। কাছে ঘেঁষিয়া বলিল, —"শুনেছেন, ক্ষিতীশবাবু, আপনার মাষ্টার ত একদম খতম !"

মনে হইল, পীঠের উপর কে যেন সজোরে এক ঘা বেত কসাইয়া দিল।

দুই চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই হাবুল বলিল,—"আহা, মানে বুঝলেননা কথাটার? প্রাণে অবশ্য নয়, তবে—পয়সায়, মানে, মর্য্যাদায় বুঝেছেন?"

আর সহ্য করিতে পারিলামনা। তর্জ্জন করিয়া বলিলাম,—"দেখ হাবুল, তোমার মূলাজোড়ের রূপ দেখেছি, এলাহাদের রূপ দেখেছি, মাষ্টার-মশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে যে রূপ দেখিছিলে, তাও মনে আছে;—আর আজকের রূপও তোমার দেখছি। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারিনি, তুমি কি চীজ!"

হাবুল চটিলনা, হাসিয়া উত্তর দিল,—"দেখুন, ক্ষিতীশবাবু, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর প্রশংসিত মানুষ থাকে। এক জিনিয়াস্—যে আপনার ভারে কাটে, জোগাড়ের ধার ধারে না। আর একটি হচ্ছে ইনটেলিজেণ্ট। যে শুধু নিজের চেষ্টা যত্ন আর যোগাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়,—জিনিয়াসকে দাবিয়ে নিজেকে বড় ক'রে তোলে। আমি হচ্ছি সেই ইনটেলিজেণ্ট!—বুঝেছেন?"

বুঝিয়াই উত্তর দিলাম,—"ঠিক! কিন্তু আমার ভাষায় তোমার মত ইনটেলিজেণ্টের অর্থ কি শুনবে?—ধড়িবাজ!"

সেতু

ছয়

এক

পাশাপাশি দুইখানি জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ গ্রাম। মধ্যস্থল দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের কাটানো একটা সঙ্কীর্ণ খাল গ্রাম দুইখানির স্বাতন্ত্র্য যেন অতি সতর্কভাবেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। খালের দক্ষিণ পার্শ্বে ধনেখালি গ্রাম,—অধিবাসীদের অধিকাংশই হিন্দু হইলেও, আশে-পাশে দুই-দশ-ঘর মুসলমানের বসতি যে নাই, একথা বলা চলে না। তবে সারা গ্রামখানির উপরেই যে হিন্দুর সার্ব্বভৌম প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কয়ঘর মুসলমান এই গ্রামে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রতিবেশী হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকায় তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা হিন্দু-ভাবাপন্ন এবং যে কারণেই হউক, প্রতিপত্তিশালী হিন্দু-পড়শীদের প্রতি তাহারা একান্ত শ্রদ্ধাশীল। হিন্দুরাও তাহাদের পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী এই কয়ঘর মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং পরস্পর পরস্পারের সুখ-দুঃখের সাথী ও সহায়। বাহিরের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দূষিত বায়ু যদিও কিছুকাল হইতে পাশের গ্রামখানির উপর বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এ গ্রামের কয়ঘর মুসলমান অধিবাসী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন!

বামদিকে যে গ্রাম, তাহার নাম আনন্দপুর। এই গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই মুসলমান। গ্রামের পুরোভাগে যে দুই-চারি ঘর হিন্দুর বসতি ছিল, তাহারা বাস তুলিয়া দিয়া স্থানান্তরে বাস পাতিয়াছে। কলিকাতা নিকটবর্ত্তী বলিয়া—সেখানকার কাটা-কাপড়ের ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এবং হাবড়া ও চেতলার হাটের ব্যাপারে এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই দর্জ্জির 'কায' করিয়া বেশ দুইপয়সা উপায় করিয়া থাকে।

এক সময় ইহাদের অভাবের অন্ত ছিল না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও গ্রামের অধিকাংশ দর্জ্জিই তখন অন্নসংস্থান করিতে পারিত না। দারিদ্র্য তখন যত নির্ম্মমভাবে ইহাদের নিষ্পেষিত করিতে থাকিত, ইহারাও ততই আগ্রহভরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিত। কায দিয়া, টাকা ধার দিয়া, তরিতরকারী কিনিয়া, ধারে রসদ যোগাইয়া, মজুর খাটাইয়া ধনেখালীর সমৃদ্ধ হিন্দু বাসিন্দারা তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের অভাব মোচনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত। অবশ্য ইহারাই যে শুধু এক-তরফা উপকার লইয়া নিরস্ত থাকিত, একথা বলা যায় না, সুযোগ পাইলেই ইহারাও প্রত্যুপকারে পরাঙমুখ হইত না। সুতরাং দুঃখের বোঝা সে সময় যতই ভারী থাকুক, মনে হিংসার চিহ্নমাত্র না থাকায় ঘরে শান্তির অপ্রতুল ছিল না।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ইহাদের দুঃখের বোঝাও হাল্কা হইয়া পড়ে। মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দপুরের দর্জ্জিদেরও সৌভাগ্যের সূচনা দেখা দেয়। গ্রামের মাতব্বর ওস্তাগরদের শূন্য দলিজগুলি দেখিতে দেখিতে গুলজার হইয়া উঠে, সিঙ্গার মেশিনের ঘর্ঘর শব্দে গ্রাম তোলপাড়। ছেলে, যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ—সকল বয়সের মরদেরাই কাযে মাতিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের তখন চাহিদা অফুরন্ত;—রেজিমেণ্টের পোষাক সরবরাহে দর্জ্জিমহলে উৎসাহের অন্ত নাই। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও যাহারা রোজ-গণ্ডা পাইত না; ওস্তাগরেরা মোটা টাকা দাদন দিয়া তাহাদের কায দেয়, পরিশ্রমিকও পূর্ব্বের তুলনায় পর্য্যাপ্ত। সুতরাং যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দপুরের দর্জ্জিদেরও অবস্থার গতি ফিরিতে থাকে।

আর্থিক অবস্থা ফিরিলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিও যেন স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী হইয়া উঠে। অন্নচিন্তা যখন মানুষের মনকে অভিভূত করিয়া তুলে, অন্য কোন চিন্তা তখন সেখানে পাত্তা পায় না। সুতরাং যে

চিন্তাগুলি এতদিন গ্রামবাসীদের চিত্তের বাহিরেই অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এইবার তাহারা উপযুক্ত সময় পাইয়া ইহাদের মনের দরজায় টোকা দিতে আরম্ভ করিল।—ধনেখালী গ্রামখানির সমৃদ্ধি কোনো দিনই আনন্দপুরের মুসলমান অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করে নাই। ধনেখালীর প্রতিষ্ঠাও নূতন নয়—বহুদিনের। সেখানে বেগবতী নদী, সমৃদ্ধ গঞ্জ, বাজার, হাট, ডাকঘর, হাইস্কুল, ডাক্তারখানা, লাইব্রেরী প্রভৃতি সবই বিদ্যমান। এই গ্রামখানির সহায়তা লওয়াটা আনন্দপুর ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলির অধিবাসীদের একান্ত অপরিহার্য্যই ছিল।

কিন্তু আনন্দপুরের ওস্তাগরদের দলিজগুলি দিন দিন যতই গুলজার হইতে লাগিল, গ্রামের অন্যান্য দৈন্যগুলিও যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের চোখে খোঁচা দিতে আরম্ভ করিল। ঘন ঘন কলিকাতায় যাতায়াতসূত্রে ও নানাস্থানের সংস্কারকদের সংস্পর্শে ইহারাও যেন ক্রমশঃই সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে দেখা গেল, সারাদিন দলিজে সেলায়ের মেশিনগুলি গর্জ্জন করে, সন্ধ্যায় গ্রামহিতৈষী সংস্কারকদের জটলা চলে। দিনে যাহারা মেশিনের খোরাক যোগাইতে কথা কহিবার ফুরসত পাইত না, রাত্রে তাহারাই অঙ্গুষ্ঠানা খুলিয়া মহাউৎসাহে কল্পনায় খেলাফতি হাতিয়ার ভাঁজিতে থাকে। দর্জ্জির 'কাম' করিয়া যে তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়, একথা তখন তাহারা ভুলিয়া যায়, প্রত্যেকেই ভাবে, তাহারা এদেশের কেহ নয়, গজনীর মামুদ বা রুমের বাদশাহের রক্ত তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া চন চন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সে দেশের বাতাস, সেখানকার ঐশ্বর্য্য তাহাদের যেন আকর্ষণ করিতে থাকে—এই ভাবে বেচারীদের মনোবৃত্তি দিন দিন উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাদের চক্ষুর উপর একটা অভিনব বেহেস্তের' সৃষ্টি করিয়া তুলে।

দেখিতে দেখিতে আনন্দপুরেও ধানের গঞ্জ বসিল। কিন্তু নদীতীরে

অবস্থিত বলিয়া ধনেখালীর গঞ্জ যেমন প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল, আনন্দপুরের গঞ্জ নদীর সহায়তা না পাইয়া অঙ্কুরেই ভাঙিয়া গেল। চাঁদা তুলিয়া ছয় মাসের খরচের টাকা জমা দিয়া গ্রামের ভিতর ডাকঘর বসান হইল, কিন্তু ছয় মাস পরে পোষ্টআফিসের কর্তৃপক্ষ হিসাব করিয়া দেখিলেন, ছয়টি মাসের ভিতর চিঠি আসিয়াছে সাতাশ খানি, ডাকঘরে চিঠি ফেলা হইয়াছে ছাপান্ন খানি, মনিঅর্ডার আসিয়াছে পাঁচটি, গিয়াছে তিনটি। সুতরাং ছয় মাসের পর এই 'এক্সপেরিমেণ্টাল' ডাকঘরটিও সরকারকে তুলিয়া লইতে হইল। হাইস্কুল বসাইবার জন্যও উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু একমাইলের মধ্যে সন্নিহিত গ্রামে প্রশংসিত হাইস্কুল থাকায়, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী পাওয়া গেল না। তখন হাইস্কুলের জন্য যে বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে এক মক্তব পাঠশালা খোলা হইল এবং ঢাকার এক মৌলভী সাহেব আসিয়া দর্জ্জিনন্দনদের কোরাণ সরিফ পড়াইবার ও গ্রামের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হলাহল বিস্তার করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। দুই কার্য্যই সমান উৎসাহে যেমন চলিতে লাগিল, দুইখানি গ্রামে একটা রেসারেসি ভাবও তেমনই গভীর হইয়া দেখা দিল।

এই সময় হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে নিলামী আদালতের বাঁশগাড়ীর ঢোলের গুরুগম্ভীর ধ্বনি আনন্দপুর গ্রামখানিকে সচকিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দর্জিজের সেলায়ের কলগুলি একসঙ্গে থামিয়া গেল। 'কাম' ফেলিয়া সবাই ছুটিল অকুস্থলে—যেখানে আদালতের নাজীর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিলামদারকে দখল দিতেছিলেন তখনই প্রকাশ পাইল যে, ধনেখালীর রামধন হালদার আনন্দপুরের মোটা রকমের জোতদার নামদার মোল্লার

ভিটেবাড়ী, ভদ্রাসন ও সমস্ত জমি-জেরাৎ নীলামে খরিদ করিয়া লইয়াছে। তাহারই দখল লইতে বাঁশগাড়ী পাতিয়া ঢোল পিটিয়া সারা গ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

দলিজে দলিজে সেদিন আর 'কাম' বসিল না,—এই অপ্রত্যাশিত স্বপ্নাতীত অপ্রিয় কাণ্ডটি বিনামেঘে বজ্রপাতের মত দক্ষিনমহলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। হালদারের পো এমন নির্ঘাতরূপে শুধু ত' নামদার মোল্লার ভিটের উপর বাঁশগাড়ী করে নাই—সে যে আনন্দপুরের সমস্ত মোসলেম সন্তানের বুকের উপর এই ভীষণ বাঁশগাড়ী চাপাইয়া দিয়াছে! ঘটনার সময় সবারই রক্ত উষ্ণ হইয়া ছুটিয়াছিল, দু'-দশ গাছা লাঠিও যে সংগৃহীত হয় নাই, তাহাও নয়; কিন্তু ধনেখালীর রামধন হালদারও কেউ কেটা নয়! পাটকলে পাটের ফেঁসো যেভাবে বাতাসে উড়িয়া যায়,—কলের অফুরন্ত টাকাও ঠিক সেইভাবে উড়াইয়া আনিতে তাহার পটুতা নাকি অসাধারণ। টাকা লইয়া তাহার ছিনিমিনি খেলার কথা এই অঞ্চলে প্রবাদের মত রাষ্ট্র। সুতরাং এই দখলি ব্যাপারে আদালতের পদস্থ কর্ম্মচারী হইতে পুলিশের এত অধিক লালপাগড়ীর সমাবেশ হইয়াছিল যে, এ পক্ষের গায়ের ঝাল গায়েই মাথা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

সন্ধ্যার পর হাজি হোসেন খাঁর দলিজে একটা বড় রকমের পরামর্শ সভা বসিয়া গেল। হোসেন খাঁ-ই এই গ্রামখানির মাথা বিশেষ। আশে-পাশে দশ বারোখানি গ্রামের মধ্যে তিনিই একমাত্র 'হাজী'। বৎসর কয়েক হইল মক্কা সরিফে গিয়া 'হজ' সারিয়া তিনি হাজী হইয়া আসিয়াছেন। একে ত' এই অঞ্চলের মধ্যে এই খাঁ বংশের প্রসিদ্ধি ও আভিজাত্যের মর্য্যাদা সর্ব্বজনমান্য, তাহার উপর 'হজ' করিয়া আসায়, হাজী হোসেন খাঁর মান-মর্য্যাদা আরও শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক তাঁহাকে পীর-পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। হাজী সাহেব শুধু যে

সম্মানেই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা নয়, ধনসম্পত্তিতেও তাঁহার খ্যাতি যথেষ্ট। ঘর-বাড়ী, পুকুর-বাগান, ক্ষেত-খামার, ফ্যালাও কারবার, টাকার লেন-দেন—তাঁহার প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেয়। লেখাপড়াতেও তিনি এই গ্রামখানির মধ্যে একমাত্র 'লায়েক' এবং তাঁহার ইংরাজী, আরবি ও ফরাসী ভাষায় 'এলেম' দেখিয়া গ্রামবাসীদের তাক লাগিয়া যায়। ধনেখালীর হাইস্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীতে দুই বৎসর হিসাবে বিদ্যার কসরৎ করিয়া অতি কষ্টে তিনি প্রথম শ্রেণীর দরজায় মাথা গলাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনটী বৎসর এই শ্রেণীতে মাথা ঘষিয়াও উপরের দিকে ঘেঁষিতে পারেন নাই। আরবী-ফারসীর 'এলেম' অবশ্য এই বিদ্যালয় হইতেই অর্জ্জন করেন নাই,—মক্কা-সরিফে কয়েক মাস কাটাইয়া নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই অসামান্য 'এলেম' উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

গ্রামের যত কিছু সংস্কারের ব্যাপার চলিয়াছে, হাজি হোসেন খাঁই তাহার অগ্রণী। ইহার কথাই সারা গ্রামের কথা। হাজী হোসেনের অভিমতই গ্রামবাসীদের মত! তথাপি কোনও কিছু নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে হাজীসাহেব দলিজে দলিজে খবর দেন, ছোট বড় সকলকেই আহ্বান করেন, তাহাদের উপস্থিতিতে তিনি উল্লসিত হন এবং মনোযোগ দিয়া সকলের কথাই শুনিয়া থাকেন। কিন্তু 'কাষ্টিং' ভোট' দিয়া চেয়ারম্যান যেন সিটিং ফতে করেন, হাজীসাহেবও তেমনই সর্ব্বশেষে নিজের ইচ্ছাটুকু বহাল করিয়া সর্ব্বসাধারণের রায় বলিয়া ফতোয়া দেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও, যখন হোসেন খাঁ 'হাজী' হন না, তখন পর্য্যন্তই কেহ তাঁহাকে কোনরূপ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে দেখে নাই। আশৈশব একই বিদ্যালয়ে ধনেখালীর হিন্দু সহপাঠীদের সংস্পর্শে থাকায়, সমবয়সী হিন্দু-সমাজে তাঁহার সুহৃদের অভাব ছিল না। প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের

সরস্বতী পূজার উৎসবে তাঁহার গভীর উৎসাহ—হিন্দু-ছাত্রদের চমৎকৃত করিয়া দিত। উৎসবের যে সকল কাজ তাঁহার সংস্পর্শে অবাধে চলিতে পারিত, বাছিয়া বাছিয়া সেই কাজগুলির ভার তিনি লইতেন, নানাবিধ তরীতরকারী তিনি যোগাইতেন এবং পূজা-মণ্ডপের বাহিরে থাকিয়া ও প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বসিয়া ভোজন করিয়া তিনি তখন সহপাঠী হিন্দুছেলেদের মতই উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। বিদ্যালয়ের সংস্রব কাটাইবার পর যখন তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হয়, তখনও তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়টি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হলাহলে বিষাক্ত হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু একটি দিনের সভায় পূর্ব্ববঙ্গের এক মৌলবী সাহেবের ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল। এই মৌলবীটী গ্রামে গ্রামে তাঁহার প্রচার কার্য্য চালাইতেছিলেন। আনন্দপুরেও এই সদভিপ্রায়টী লইয়াই মহোৎসাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিক্ষার সহিত যাহাদের পরিচয় যত অল্প, ধর্ম্মের নামে তাহাদের মাতাইয়া তোলা ততই সহজ। মৌলবী সাহেব হোসেন খাঁর দলিজেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। সভার পর উভয়ের মধ্যে নানা সদালাপই চলিত। মৌলবী সাহেব হোসেন খাঁকে বুঝাইতেন,—হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের কাযকর্ম্মে যোগ দেওয়া শুধু যে অনুচিত তা নয়,—ভয়ঙ্কর অপরাধ! এমন 'গুণা' ভুলেও করিয়ো না। তুমি কত বড় বংশের ছেলে! হয়ত এমন হওয়াও বিচিত্র নয়,—জেঙ্গীস খাঁর সঙ্গে তোমার বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—নবাব সায়েস্তা খাঁই যে এই বংশের কেউ ছিলেন না—তাই বা কে বলিতে পারে?

মৌলবীর কথায় হোসেন খাঁর বুকের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে,—দুই চক্ষু মুদিত করিয়া তিনি তখন জেঙ্গীস খাঁ, সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি মহারথীদের জবরদস্ত মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করেন,—সুতরাং হোসেন খাঁর সুর যেমন ফিরিল, গ্রামের সুরও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাইয়া গেল।

অতঃপর মৌলবী সাহেবের উপদেশমত হিন্দুসংস্পর্শজনিত বহুদিনের অর্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হোসেন খাঁ মক্কা-সরিফে পাড়ি দিলেন এবং যখন হাজী হইয়া ও যে বহুদর্শিতা লইয়া আনন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি যেমন বিদ্বেষপ্রিয় একশ্রেণীর মুসলমানের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার পুরাতন হিন্দু-বন্ধুদের সংস্রব হইতেও তেমনই দূরে সরিয়া পড়িলেন।

তিন

নামদার মোল্লার ভিটে বাড়ী নিলামের ব্যাপার লইয়া হাজী সাহেবের দলিজে যে সভা বসিল, তাহাতে রোষ, দ্বেষ ও উত্তেজনার প্রবাহ ছুটিয়া গেল ; কিন্তু কাযের কিছুই হইল না। নামদার মোল্লা লোকটা ববাবরই বে-হিসেবী ও আমীরী মেজাজী ছিল। দেনায় দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত তাহার ছাপাইয়া উঠিয়া ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে, সে যখন নিরুপায় হইয়া রামধন হালদারের নিকট যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক রাখিতে ব্যস্ত হয়, সে কথা গ্রামের মাতব্বরেরা সে সময় জানিয়াও কোন কথা কহেন নাই। নামদার প্রথমেই স্বগ্রামে স্বজাতির দুয়ারেই ঋণপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেয় নাই,—বরং কেহ কেহ দুই চারিটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া ফোঁড়ার উপর কাঁটার খোঁচা দিয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়াই সে বেচারী তখন রামধন হালদারের কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিল। এখন গাঙ্গের পানি ঘরের দুয়ারে আসিয়া পড়ায় ইহাদের রোষের সীমা নাই। নামদার মোল্লাকে তাহারা এসময় হাতের কাছে পাইলে হয়ত তাহাকে জীবন্ত কবরে পাঠাইয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িত, কিন্তু বে-হিসেবী হইলেও সে একেবারে নিরেট বোকা

ছিল না ;—রামধন হালদারকে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দেনার দায়ে ছাড়িয়া দিবার পরিণাম সে জানিত,—তাই একটা মোটা মাহিনার ওস্তাগরী চাকরী লইয়া সে রেঙ্গুণে পাড়ি দিয়াছিল। কাজেই গ্রামবাসীদের তাহার উদ্দেশে যত কিছু আস্ফালন, সবই ব্যর্থ হইয়া গেল।

শেষে হাজী সাহেব এই রায় দিলেন যে, নামদার মোল্লার সম্পত্তি যেমন করিয়া হউক উদ্ধার করিতেই হইবে। গ্রামের মওড়াই ঐ জায়গা। উহা যদি হাতছাড়া হইয়া যায়,—হিন্দুরা যদি ঐ ভিটেয় ঘর-বাড়ী তোলে, তাহা হইলে আমাদের মুখে চূণকালি পড়িবে। আমাদের মান-ইজ্জত জাহান্নমে যাইবে। চাঁদা করিয়া টাকা তুলিতে হইবে এবং যাহা ঘাটতি পড়িবে, হাজী সাহেব নিজেই তাহা পূরণ করিয়া দিবেন।

রায় শুনিয়া সবাই হাজী সাহেবের নামে জয়ধ্বনি তুলিয়া বাড়ী ফিরিল।

পরদিনই হাজী সাহেবের তরফ হইতে একজন প্রতিনিধি রামধন হালদারের সহিত দেখা করিয়া প্রস্তাবটা পাড়িল। সে জানাইল যে, হালদার মহাশয় যে টাকায় নামদার মোল্লার সম্পত্তি কিনিয়াছেন, হাজী সাহেব সেই টাকা তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছেন—তিনি সম্পত্তি ফিরাইয়া দিন।

কিন্তু রামধন হালদার উত্তর দিলেন,—"আমি নামদার মোল্লার সম্পত্তি তাহার ইচ্ছানুসারেই কিনেছি। কোনদিক দিয়াই আমি তাকে বঞ্চিত করি নাই। আর এই সম্পত্তি কিনেছি ভোগ করবার জন্য—ফিরিয়ে দেবার জন্য নয়!"

হাজী সাহেব রামধন হালদারের বক্তব্য শুনিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন! কিন্তু তখন রাগ করিয়া লাভ যে কিছু নাই, তাহা বুঝিলেন,—আবার লোক পাঠাইয়া জানাইলেন,—মুসলমানের ভিটেয় হিন্দুর বাস করা কি ভাল কথা? এতে নিজের সমাজেও তিনি খাটো হবেন, আর এই

ব্যাপার নিয়ে একটা রেষারেষি চিরদিন থেকে যাবে। সুতরাং হালদার মশাই নামদারের সম্পত্তিটা ফিরিয়ে দিন।

রামধন হালদার উত্তর দিলেন,—হিন্দুর ভিটেয় যদি মুসলমান বাস করতে পারে, হিন্দুও কেন মুসলমানের ভিটেয় বাস করবে না? আমার সমাজে এই ব্যাপারে আমি বড় হ'ব, কি খাটো হ'ব, সে ভাবনা আমার। হাজী সাহেবের এজন্য এত মাথাব্যথা কেন? হিন্দুরা যখন একসময় ওগ্রাম থেকে বাস তুলে উঠে এসেছিল এবং মুসলমানেরা তাদের ভিটেয় বাসা পেতেছিল, তখন সেই ব্যাপার নিয়ে যখন রেষারেষি হয়নি, আজই বা হবে কেন? ও-সম্পত্তি আমি কিছুতেই হাতছাড়া ক'রব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।

ইহার উপর আর কথা চালাচালি চলে না, কাজেই হাজী সাহেবের তরফ হইতে তখন কথা ছাড়িয়া কাযের আয়োজন হইতে লাগিল। হাজী সাহেবের বাড়ীতে খুব গোপনে এক পরামর্শ-সভা বসিল এবং সভায় স্থির হইয়া গেল যে, আনন্দপুরের মক্তবের সম্মুখে আগামী জুম্মার নামাজের পর রীতিমত তোড়জোড় করিয়া এক সভা হইবে। আশেপাশের গ্রামগুলিতে যে সব মুসলমান বাসিন্দা আছে, সকলকেই সেই সভায় যোগদান করিতে আহ্বান করা হইবে। সেই সভায় হিন্দুদের গোস্তাকীর কথা তুলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধও লওয়া হইবে।

সারা গ্রাম জুড়িয়া একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামখানির ভিতর যেখানে যত বাঁশঝাড় ছিল, লাঠীর যোগ্য বাঁশ আহরণের ব্যাপারে ঝাড় উজাড় হইতে বসিয়াছে। কিছুদিন হইতে কাযের বাজারে ভাঁটা পড়ায় অনেকেই হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল, নূতন কাযের সাড়া পাইয়া তাহারা তুড়িলাফ খাইয়া আসরে নামিল।

যে বিরাট সভার সান্নিধ্য সকলকেই সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে হাজীসাহেব স্বয়ং সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন! হাজীসাহেব জানিতেন, তাঁহার বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত একটা বিরাট লোহার সিন্ধুকের ভিতর কোরাণ-সরিফের একটা বহু পুরাতন দপ্তর আছে; এ পর্য্যন্ত তাহা খুলিয়া পড়িবার সুযোগ তাঁহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই।

হঠাৎ কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তখনই হাতের কায ফেলিয়া সেই বহুপুরাতন লোহার সিন্ধুকের ডালা খুলিয়া ফেলিলেন। খেরোর কাপড়ে বাঁধা একটা অতি প্রাচান দপ্তর দেখা গেল। হাজীসাহেব একান্ত আগ্রহে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সযত্ন সঞ্চিত সেই পুরাতন দপ্তর খুলিতে বসিলেন। নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে সভায় বলিবার মত মুখরোচক ও উল্লেখযোগ্য বয়েদ কিছু বাহির হইয়া পড়িবে—এই আনন্দে তাঁহার মুখখানি তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দপ্তর খুলিতেই প্রথমেই চিঠির মত ভাঁজ করা কয়েক খণ্ড কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। ভাঁজ খুলিতেই দেখা গেল, কাগজগুলি নথীর আকারে সূতা দিয়া বেশ যত্ন সহকারে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। কাগজগুলি যদিও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় নাই। চক্ষুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া হাজীসাহেব সেগুলি পড়িতে বসিলেন। যদিও পত্রের অংশবিশেষ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সকল পংক্তির পাঠোদ্ধার সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু পল্লীগ্রামের লেখকের হাতের টানালেখা সুন্দর ভাবে পড়িবার ও বুঝিবার একটা ক্ষমতা হাজীসাহেব পঠদ্দশা হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রায় একটি ঘণ্টা কসরতের পর হাজীসাহেব পত্র দুইখানির পাঠোদ্ধার যখন করিলেন, সকল ইন্দ্রিয়ই যেন তাঁহার সে সময় একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত সংসার যেন তাঁহার অবশ শিথিল দেহ লইয়া দোল খাইতেছে।

হাজীসাহেব বহু পরিশ্রমে যে দুইখানি পত্রের পাঠোদ্ধার করিলেন, তাহাদের মর্ম্ম এইরূপ :—

প্রথম পত্রের প্রেরক আনন্দপুরের হরেকৃষ্ণ খাঁ,—তিনি তাঁহার শ্বশুর ধনেখালীর দুর্য্যোধন হালদারকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন,—

বাধ্য হইয়াই আমাকে সপরিবারে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। আমার পূর্ব্বপুরুষদের রক্ত এখনও আমার ধমনীতে বহিতেছে এবং পরবর্ত্তীকালেও আমার বংশধরদের মধ্যেও বহিবে। কেন যে আমাদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। কিন্তু আমাদের এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্পূর্ণই বাহ্যিক ব্যাপার। পুরাতন সংস্কার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না এবং আমাদের বংশধরগণও একথা মনে রাখিবেন যে, আমাদের রক্তের অংশ তাহাদের দেহে বহিতেছে,—তাহারা এই দেশেরই এবং এই পুরাতন খাঁ বংশেরই সন্তান। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে মার্জ্জনা করিলেই আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

পত্রের নীচে নাম স্বাক্ষর ছিল,—

দাসানুদাস শ্রীহরেকৃষ্ণ খাঁ
সাং আনন্দপুর

দ্বিতীয় পত্রখানি প্রথম পত্রের সহিত এক সঙ্গে সূতা দিয়া গাঁথা ছিল। ধনেখালীর দুর্য্যোধন হালদার এই পত্রের প্রেরক হরেকৃষ্ণ খাঁয়ের বরাবর ইহা লিখিয়াছেন।—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম ও যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। তোমার বরাবর আমার এই শেষ পত্র জানিবে। সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া কঠোর নির্য্যাতন ও সমূহ অসুবিধা সহ্য

করিয়া যে স্বধর্ম্মে আস্থাবান থাকে, সে-ই মানুষ। নির্য্যাতন আমার উপর কম হয় নাই—প্রলোভনও অল্প আসে নাই, কিন্তু আমি মানুষের মতই সহিয়াছি ও বরাবরই সহিয়া যাই। তুমি লিখিয়াছ যে, বাহিক-ভাবে ধর্ম্মত্যাগ করিলেও তুমি স্বধর্ম্মে আস্থাবান আছ। ইহা অত্যন্ত ভুল। তুমি জীবিতকালে ইহা মানিয়া চলিলেও, তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা একথা কখনোই মানিবে না—তাহারা সমস্তই ভুলিয়া যাইবে। পূর্ব্বপুরুষ যে হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু-রক্ত যে তাহাদের ধমনীতে বহিতেছে ইহা তাহারা ত স্বীকার করিবেই না, বরং ইহাদের আক্রোশ তখন হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের উপর অধিক সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে। তোমার পত্রও আমার দপ্তরে রাখা সমীচিন মনে করিলাম না, অত্র সহ ফেরৎ পাঠাইতেছি।

স্বাক্ষর ছিল—শ্রীদুর্য্যোধন হালদার, সাং ধনিয়াখালি

পুরাতন দপ্তরের ভিতর হইতে যে এমন অপ্রত্যাশিত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িবে,—কেঁচোর গর্ত্ত হইতে সাপ দেখা দিয়া এ ভাবে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিবে,—একথা হাজীসাহেব কল্পনাও করেন নাই।

দুই হাতে মাথার দুই পার্শ্ব টিপিয়া ধরিয়াই হাজীসাহেব বসিয়া পড়িলেন,—তাঁর মুখ দিয়া বহুক্ষণ একটি কথাও সরিল না।

সেইদিনই অপরাহ্নে রামধন হালদার তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠক-ঘরের সম্মুখে হাজীসাহেবকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বিষম বিদ্রোহ তুলিয়া বসিয়াছে, এ ভাবে তাঁহারই বৈঠকখানায় তাঁহার উপস্থিতি অল্প বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নাই।

হাজীসাহেব কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া কহিলেন,—"একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি হালদারমশাই। এ কথার সঙ্গে নামদার মোল্লার জমিজেরাতের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমি শুধু এই কথা

জানতে এসেছি। যে, আপনার বংশে দুর্য্যোধন হালদার বলে কেউ ছিলেন কি ?”

প্রশ্ন শুনিয়া রামধনের বিস্ময়ের অন্ত নাই। কি একটু ভাবিয়া পরক্ষণেই উত্তর দিলেন,—“বিলক্ষণ! তিনিই যে হালদার বংশের আদিপুরুষ। আমাদের বংশের কুরচিনামায় তাঁরই নাম প্রথমে পাওয়া যায়।”

হাজীসাহেবের বুকের ভিতর তখন উদ্দীপনার প্রবাহ বহিতেছিল। বুকখানিকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন ;—“যদি কোনো অপরাধ না ল’ন ত’ আর একটা অনুরোধ আপনাকে করি।”

হাজীসাহেবের মুখের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া রামধন হালদার কহিলেন,—“স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।”

হাজীসাহেব কহিলেন,—“সেই কুরচিনামাখানা একবার আমাকে দেখাবেন ?—মিনিট কতকের জন্য ?”

রামধন :হালদার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—“কেন বলুন ত ? আমার বংশের কুরচিনামা নিয়ে আপনার কি কায ?”

উদ্‌ভ্রান্তভাবে হাসিয়া হাজীসাহেব উত্তর দিলেন,—“কায কিছু নয়,—একটা জায়গায় মস্তবড় ধোঁকা লেগেছে—একটা নাম নিয়ে। ব্যাপারটা অবশ্য আপনাকে শুনিয়েই যাব। দেখাতে আপত্তি আছে কি ?”

রামধন হালদার উদাস ভাবে কহিলেন,—“আপত্তি আর কি,—উঠে দেখতে পারেন—ঐ যে দেওয়ালেই টাঙ্গানো রয়েছে, দিন কতক হ’ল ওটাকে বাঁধিয়ে রেখেছি।”

প্রকাণ্ড এক সীট কাগজে মুক্তার মত হাতে লেখা অক্ষরে হালদার বংশের কুরচিনামা ছবির আকারে সেই ঘরের একদিকে টাঙ্গানো ছিল। হাজীসাহেব টলিতে টলিতে তাহার কাছটিতে গিয়া দাঁড়াইলেন।

নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিলেন,—প্রথমেই বড় অক্ষরে লেখা আছে—দুর্য্যোধনের নাম। তাহার নিম্নেই একপুত্র এ এক কন্যার বিবরণ। পুত্রের নাম যাদুধন, কন্যার নাম আনন্দময়ী ;—তাহার পার্শ্বেই লেখা—আনন্দপুরের হরেকৃষ্ণ খাঁয়ের সহিত বিবাহিতা!—লেখার অক্ষরগুলি ক্রমশঃই যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইতেছিল ; দুই চক্ষুর দৃষ্টি যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া হাজীসাহেব পরবর্ত্তী মন্তব্য পড়িতে লাগিলেন। স্পষ্টই দেখিলেন, তাহার পর লেখা রহিয়াছে—এই কন্যার বংশলোপ !

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া হাজীসাহেব টলিতে টলিতে তক্তাপোষের উপর ঢালা বিছানায় ঢলিয়া পড়িলেন !

চার

সভার কিন্তু কোনো ব্যতিক্রমই হয় নাই। কোনদিক-দিয়াই তাহার আড়ম্বরের অভাব ঘটে নাই। বিশাল প্রাঙ্গণ জনতায় ভরিয়া গিয়াছে। হাজীসাহেব বক্তৃতা করিতে উঠিতেই নানাকণ্ঠে তাঁহার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি উঠিল! হাজীসাহেব সেই বিপুল জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"ভাই সব ! তোমরা সকলেই নিবিষ্ট মনে শোন,—এতদিন যে ভুলের বোঝা আমি মাথায় করে মিছে হায়রাণ হ'য়ে বেড়িয়েছি—আজ সে বোঝা তোমাদের সামনে নামিয়ে দেব।—সব ঝুটো ! সব ঝুটো ! সমস্তই ভূয়ো ! আমরা ভাবি—প্রত্যেকেই আমরা মনে মনে ঠিক দিয়ে রাখি—বাঙলা দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করেও আমরা বাঙালী নই,—আমাদের যত কিছু সম্বন্ধ তুর্কিদেশে, গজনীতে, খোরাসানে। তোমরা সবাই আমাকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মানী বলে মানো,—কেননা, তোমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস—আমার বংশমর্য্যাদা

সবার চেয়ে উঁচু। আমিও এই আভিজাত্য নিয়ে বরাবর স্পর্দ্ধা ক'রে এসেছি; কিন্তু সে ভুল আমার আজ ভেঙে গেছে। কে এ ভুল আমার ভেঙে দিয়েছে জান? আমারই পূর্ব্বপুরুষের হাতের লেখা একখানা চিঠি! সে চিঠি আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। এই চিঠি পড়লেই তোমরা অনেকেই বুঝবে—আমরা কেউ গজনীর নই, খোরাসানের নই—আমরা বাঙলার। তোমরা শুনে স্তম্ভিত হবে,—আমার আদিপুরুষ জেঙ্গিস খাঁ নন, সায়েস্তা খাঁও নন, এই আনন্দপুরেরই এক হিন্দু, তাঁর নাম ছিল—হরেকৃষ্ণ খাঁ!"

বিশাল জনতা একথায় একেবারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এ কি অসম্ভব কথা হাজী হোসেন খাঁর মুখে! হাজীসাহেব হাত তুলিয়া জনতাকে সংযত করিয়া কহিলেন,—"আরও একটা বিস্ময়ের কথা শোনো,—ধনেখালীর যে রামধন হালদারের বিরুদ্ধে আমাদের এই সভা,—যার সঙ্গে আমাদের লাঠালাঠির সূত্রপাত হয়েছে, সেই রামধন হালদারের আদিপুরুষ দুর্য্যোধন হালদারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন—আমারই আদিপুরুষ হরেকৃষ্ণ খাঁ!—পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে যে পত্র আমি পেয়েছি তোমাদের তা পড়ে শোনাচ্ছি,—শুনলে তোমরাও আমারই মতন স্তব্ধ হয়ে যাবে—তোমাদের মাথা থেকেও ভুলের বোঝা সরে' পড়বে।"

পত্র দুইখানি শুনিয়া জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, কাহারও মুখে কথা নাই। যাহারা জেহাদের নামে সাজিয়া আসিয়াছিল, তাহারাও নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—"ইয়া আল্লা!"

তারপর যখন হাজীসাহেব ভাবগদ্‌গদ্‌স্বরে জানাইলেন,—"ভাই সব! মেহেরবান আল্লার ইচ্ছাতেই আমাদের আদিপুরুষের দুইখানা চিঠি আমাদের মাথা থেকে যেমন ভুলের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে,—এই গ্রাম দুইখানার মধ্যে তেমনই একটা মিলনের সেতুও বেঁধে দিয়েছে।—আর

আমাদের ঝগড়া নাই। আমার ভাই রামধন হালদার নামদার মোল্লার সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্বে ছেড়ে দিয়েছেন—আমাদের মক্তবের নামে।”

নিস্তব্ধ জনতা এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—তাহাদের আনন্দ-কল্লোলে আনন্দপুর ভরিয়া গেল ;—সবারই মুখে এক কথা—‘আর আমাদের ঝগড়া নাই,—হিন্দু আমাদের ভাই।” জনতার ভিতর হইতে ইংরাজী স্কুলের এক তরুণ ছাত্র দৃঢ়স্বরে কহিল,—“আমাদের মাঝে যে দরিয়া ছুটে চলেছিল, হাজীসাহেব আর হালদার মশাই তার ওপর নতুন রকমের ‘সেতু’ বেঁধে দিলেন !”

হাজীসাহেবও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—“যে ভুল বরাবর করে এসেছি আমরা, এ তারই মাশুল !”

নববর্ষ

সাত

এক

মেকাঞ্জি-মিলার নামকরা সওদাগরী প্রতিষ্ঠান। নানাসূত্রে সহরবাসীর সহিত এই সরবরাহকারী কোম্পানীর যোগসূত্র দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দৃঢ়তর হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু মিষ্টার ম্যাকভেণ্ট যে দিন এই আফিসের এজেণ্ট হইয়া আসিলেন, তাহার পর দিন হইতেই পুরাতন আইন-কানুন যেমন বদলাইয়া গেল, জনসাধারণের প্রতি কর্তৃপক্ষদের আচরণও তেমনই রূঢ় হইয়া উঠিল। টাকা জমা দিতে আসিয়া গ্রাহকেরা আর পূর্ব্বের মত সদয় ব্যবহার পায় না, নির্দ্দিষ্ট স্থানটি ব্যতীত আফিসের ভিতরে যদি কেহ ভুলক্রমেও ঢুকিয়া পড়ে তাহার লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না; আফিসের কোনো বাবুর সহিত তাহার আত্মীয়স্বজনেরও সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। এমনই সব আইন-কানুন আফিসের সর্ব্বত্র জারী হইয়া বাবুদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; নূতন সাহেবের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে টিফিনের সময় জলখাবারের ঘরে বাবুদের রীতিমত আলোচনা হয় নিত্যই, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে কাহারও সাহসে কুলায় না।

রজনী রায় এই আফিসে বিল ডিপার্টমেণ্টের এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। দিব্য সুন্দর স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহ, বয়স প্রায় বত্রিশ। তরুণ পর্য্যায়ের গণ্ডী যদিও পার হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তারুণ্যের তেজটুকু এখনও পূর্ণ মাত্রায় তাহার কমনীয় দেহখানি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই যুবার জন্য বিল ডিপার্টমেণ্টের উপর সাহেবের কড়া নজর পড়িয়াছে; যেহেতু, এতবড় আফিসের মধ্যে একমাত্র রজনী রায় সাহেবের আইন-কানুনের মর্য্যাদা যথাযথভাবে মানিয়া চলে না, কেহ কোনও কারণে অসুবিধায় পড়িলে সে

যথাসাধ্য সহায়তা করিতে ছোটে। ডিপার্টমেণ্টের সহকর্ম্মীরা আপত্তি তুলিলে, সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয়,—এটাও ডিউটী, পাবলিকের পয়সাতেই মেকেঞ্জি-মিলার, তাদের 'ডোণ্ট কেয়ার' করাটাও ঠিক নয়। ডিপার্ট-মেণ্টের এক বর্ষীয়ান বাবু দুই চক্ষু পাকাইয়া বলেন,—ম্যাকভেণ্ট সাহেবের সামনে গিয়ে লেকচারটা দিয়ে এসো না! রজনী গম্ভীর হইয়া বলে,—"টিফিনের সময় আপনাদের সভায় আমাকে কোনদিন কিছু বলতে শুনেছেন স্যার? আমি লেকচার বুঝি না, বুঝি কায। নিজের সীটে বসে যথাশক্তি করি, সাহেবের ঘরে যাবার ধার ধারি না।" বড়বাবু তাঁহার টেবিলে বসিয়া কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি এবার শ্লেষের সুরে বলিলেন,—"তুমি যেরকম বাড়াবাড়ি করে তুলেছ রজনী, তাতে বাঘ পালে এসে পড়লো বলে'।" রজনী উত্তর দিল,—"পালের সবাই যদি ঠিক থাকে, বাঘ পালে পড়েও কারুর ঘাড় ভাঙতে পারে না, বড়বাবু!"

কিন্তু বড়বাবুর কথাটাই অবিলম্বে ফলিয়া গেল, বাঘ একদিন সত্যই পালে আসিয়া পড়িল। বাঘের থাবা হইতে রজনী তাহার ইজ্জতটুকু বাঁচাইল বটে, কিন্তু আট বৎসরের পাকা কাযটুকু হারাইল।—সাহেবের সহিত এই সামান্য কেরাণীটির সংঘাত ও সেই সূত্রে ঘটনাচক্রে যে অসামান্য ঘটনার সমাবেশ হয়, তাহা লইয়াই আমাদের এই আখ্যায়িকা।

দুই

সেদিন পয়লা বৈশাখ। চৈত্রমাসের গোড়া হইতেই সহরে গরমের প্রাচুর্য্য দেখা দিয়াছে। মাসের শেষাশেষি হইতেই বড় বড় আফিসের দরজা জানালায় খশের পরদা পড়িয়াছে, বাহিরে প্রচণ্ড গরম, পথে বাহির হইলেই উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের অসহ্য প্রহার, প্রচণ্ড তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে।

বিল ডিপার্টমেণ্টের রেলিংএর বাহিরে দাঁড়াইয়া এক বাঙালী ভদ্রলোক তাঁহার নামের বিলখানি বড়বাবুর টেবিলে দাখিল করিয়া বলিলেন,—"এতে ভুল আছে স্যার, ঠিক করে দিন।"

বড়বাবু তখন এক জরুরী ফাইল লইয়া ব্যস্ত। ফাইলের উপর বাহির হইতে অপরিচিতের বিলখানি পড়িবামাত্রই তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন, সজোরে কাগজখানি বাহিরে আগন্তুকের দিকে ছুড়িয়া বলিলেন,—"দেখতে পাচ্ছেননা, বসে নেই আমি, কায করছি। ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন।"

কিন্তু বিলখানি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলেও সেখানি বাতাসে উড়িয়া রজনীর টেবিলের উপর গিয়া পড়িল। ভদ্রলোক নিরুত্তরে রজনীর সীটের সম্মুখে আসিতেই রজনী সেখানি তুলিয়া বলিল,—"দাঁড়ান আপনি, আমি চেক করে দিচ্ছি।"

বড়বাবু চক্ষু পাকাইয়া রজনীর দিকে চাহিলেন। রজনী লেজার খুলিয়া মিলাইয়া ও যে অঙ্কটি ভুলক্রমে বিলে লেখা হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া নিজেই বড়বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"এটা আমারই সেক্‌সনের বিল বড়বাবু, তাই যেন আপনার হাত থেকে একেবারে আমারই টেবিলে গিয়েই হাজির! টাইপের ভুল, শুধরে দিয়েছি।"

বড়বাবু তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন,—"আগে নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল হত! ফাইলটা সেরেছ?"

রজনী বলিল,—"নিশ্চয়ই; এখনই চাই?"

বড়বাবু মুখখানি গোঁজ করিয়া ফাইলে মন দিলেন, রজনীর কথার উত্তর পাওয়া গেল না। রজনী তাঁহার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"আপনিই যদি পাবলিকের ওপর এমন কঠিন হন, সাহেবের কি দোষ বলুন!"

বড়বাবু নিরুত্তরে আড়চোখে চাহিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতেছিল, কিন্তু রাগটুকু ব্যক্ত করিবার কোনও উপলক্ষই মিলিল না।

ভদ্রলোক বিলখানি ফেরত লইয়া রজনীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—"ওঁর কাছে গিয়ে আমি ভুল করেছিলাম।"

রজনী বলিল,—"ভুল করেন নি আপনি, ঠিক জায়গাতেই গিয়েছিলেন, আপনার বিলখানাও উড়ে এসে পড়ল ঠিক জায়গায়, আর যে ভুলটুকু ছিল, তাও ঠিক হয়ে গেল, ব্যস্। আচ্ছা, নমস্কার।"

ভদ্রলোক বলিলেন,—"আর একটু কষ্ট দেব আপনাকে স্যার, খাবার জল এক গ্লাস পেতে পারি? আসছি অনেক দূর থেকে, ভারী পিপাসা পেয়েছে স্যার।"

বেহারাকে ডাকিয়া জল আনাইতে বিলম্ব হইল না। রজনী বেহারার হাত হইতে জলপূর্ণ গ্লাসটি লইয়া রেলিংয়ের উপর দিয়া তৃষ্ণাতুর আগন্তুকের হাতে দিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় তাহার স্কন্ধে পড়িল একখানি-কঠিন হাতের প্রবল ঝাঁকুনি; সঙ্গে সঙ্গে জলের গ্লাসটি সশব্দে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

রজনী আড়ষ্টভাবে সচকিতে ফিরিয়া দেখিল, আফিসের হর্ত্তাকর্ত্তা স্বয়ং ম্যাকভেল্ট সাহেব অতর্কিতভাবে আসিয়া বাঘের মত তাহার কাঁধের উপর হাতের থাবা দিয়াছে! রজনী মুখ ফিরাইতেই তাহার দুটি চক্ষুর সহিত সাহেবের জ্বলন্ত দৃষ্টির সংঘাত হইল; ডিপার্টমেণ্ট কাঁপাইয়া গম্ভীরস্বরে সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—"আমি জানতে চাই এ ডিপার্টমেণ্টে কি তোমার ডিউটি বাবু?"

প্রবল এক ঝাঁকুনিতে মুহূর্ত্তে আপনাকে সাহেবের কবলমুক্ত করিয়া অকুতোভয়ে রজনী বলিল,—"আমি এ ডিপার্টমেণ্টের একজন সামান্য ক্লার্ক, বিল চেক করা আমার কাজ; আপনি মাষ্টার, মুখে বা কাগজে কলমে

একশোবার আমার কাযের কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন ; কিন্তু আমার গায়ে এভাবে হাত দেবার আপনার কি অধিকার স্যার ?"

স্যার কণ্ঠস্বর আরও তীব্র করিয়া জানাইয়া দিলেন,—"যে অধিকারে মাষ্টার কুকুরের মুখে রুটির টুকরো ছুড়ে দেয়, আবার প্রয়োজন হলে তার পিঠে পদাঘাত করে।"

রজনীও সমান তালে পাল্টা জবাব দিল,—"কিন্তু সব কুকুর সে আঘাত স্বেচ্ছায় পিঠ পেতে নেয়না স্যার—তখনি টুটি কামড়ে ধরে সেই হৃদয়হীন মাষ্টারকে রীতিমত শিক্ষা দেয়—এমন কুকুরও দু' একটা থাকে !"

নবাগত বিলাতী সাহেব, এত বড় প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার, তাঁহার নিজস্ব ভাষায় উচ্চারিত রূঢ় মন্তব্যের মুখোমুখি প্রতিবাদ করে সামান্য এক নেটিভ কেরাণী ? তাহার কথা বলিবার কায়দা ও তাহাতে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের রেশ সাহেবের উদ্ধত সুরকেও যেন স্তব্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধরোষে সাহেব তখন রজনীর নাসিকা লক্ষ্য করিয়া মুষ্টি উদ্যত করিলেন। কিন্তু রজনী তাহার ব্যায়ামপুষ্ট হাতে ক্ষিপ্রভাবে সাহেবের মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত হাতখানি ধরিয়া বলিল,—"আমার কি অপরাধ সেইটি আগে বলুন, তারপর শাস্তির ব্যবস্থা করুন স্যার !"

স্যার বুঝিলেন, যাহাকে জব্দ করিতে তিনি রুখিয়াছেন, তাহার মুখের কথাগুলির মত হাত দুখানিও রীতিমত শক্ত, সুতরাং নিজের হাতখানি চালাইবার পুনঃপ্রয়াস না করিয়া কণ্ঠের উপর পরিপূর্ণ জোরটুকু দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটা আমার আফিস না হোটেল ? তোমার ডিউটি এখানে কোনটা—আফিসের কাজ করা, না, পাবলিকের পরিচর্য্যায় জলের গ্লাস তুলে ধরা ?"

সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ রজনী এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, বাহিরের একজন তৃষ্ণাতুর ভদ্রলোকের হাতে সে এক গ্লাস জল দিতে গিয়াছে এই

তাহার অপরাধ? কিন্তু এই অমানুষটির আচরণ কয়দিন হইতেই তাহার মন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; বিষের ক্রিয়া আজ চরমে উঠিয়াছে, মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক প্রেরণা আজ তাহার মনের সকল সঙ্কোচই কাটাইয়া দিয়াছে; সুতরাং আশী টাকা বেতনের মোহ, ভবিষ্যত উন্নতির মরীচিকা কোনটিই তাহার এই দুর্ব্বার প্রবৃত্তির গতি ফিরাইতে পারিল না। সাহেবের এই ভদ্রতাবিরুদ্ধ কথার উত্তরে সে বলিল,—"আমি বুঝেছি স্যার, কেন আমি সহসা আপনার রোষভাজন হয়েছি, কিন্তু আমার প্রতি আপনার এ রাগ বৃথা; কেননা, আমি অন্যায় কিছু করি নাই,—এক তৃষ্ণাতুর ভদ্রলোককে আমি এক গ্লাস জল দিতে গিয়েছিলুম, তিনি এই অফিসেরই একজন কাষ্টমার—"

সাহেব তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"তার জন্যে তোমার মাথা ঘামাবার কি দরকার! তুমি জান—আফিসের সমস্ত ষ্টাফের ওপর আমার আদেশ, কাজের সংস্রব ছাড়া বাইরের কারুর সঙ্গে কেউ কোনো কথা কইবে না?"

রজনী নিজের স্বরের উপর জোর দিয়া বলিল,—"জানি, স্যার! কিন্তু আপনারও জানা উচিত ছিল, প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমা থাকে; আমাদের জাতিগত ধর্ম্ম স্যার, তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে কেউ জল চাইলে হাতের সব কায ফেলে আগে তাকে পরিতৃপ্ত করা; আমাদের দেশের পুণ্যাত্মারা এই মাসভোর রাস্তার মোড়ে মোড়ে তৃষ্ণার্ত্তদের জল বিতরণের ব্যবস্থা করে ধন্য হন; আমিও সংস্কার বশে ভদ্রলোকটিকে জল দিতে যাই, কিন্তু আপনি নিষ্ঠুরের মত—"

কক্ষতলে সবেগে পদাঘাত করিয়া সাহেব বলিলেন,—"থামো, তোমার লেকচার শোনবার আমার ফুরসৎ নেই; শোন আমার হুকুমের চেয়ে তোমার সংস্কার যখন অত বড়, তুমি তাই নিয়ে বেরিয়ে যাও আমার আফিস থেকে এই মুহূর্ত্তে—"

চেয়ার হইতে কাশীসিল্কের চাদরখানি তুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া রজনী গাঢ় স্বরে বলিল—"ধন্যবাদ স্যার! গুডবাই—"

পরক্ষণে আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে তাহার বিগত জীবনের দীর্ঘ আট বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত কর্ম্মশালার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিল।

তিন

বাহিরে তখন রীতিমত জটলা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই রজনীর প্রশংসায় মুক্ত কণ্ঠ, সবারই মুখে এক কথা,—"বাবু বটে, একেই বলে তেজী পুরুষ, সাহেবের থোঁতা মুখখানা ভোঁতা করে দিলে!"

রজনী বাহিরে আসিতেই সকলেই তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, প্রত্যেকের ওষ্ঠই চুলবুল করিতেছে তাহার সহিত কথা কহিতে। কিন্তু রজনী ব্যগ্র-দৃষ্টিতে খুঁজিতেছিল সেই তৃষ্ণাতুর ভদ্রলোকটিকে।

সুবেশধারী এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গোড়া হইতেই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি দেখিতেছিল। সে ভীড় ঠেলিয়া রজনীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "—রাম রাম বাবুসাহেব, হামি লোক ভারি খুসী হোইয়েছে; আপনার সাথে হামার জরুরী বাত আছে—"

রজনী ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—"দাঁড়ান মশাই, আপনার কথা শোনবার আমার এখন ফুরসৎ নেই, আমি সেই ভদ্রলোকটিকে খুঁজছি—"

গেলাস ভাঙিয়া চুরমার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক ভয়ে সরিয়া আসিয়াছিলেন, হলের বাহিরে থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। রজনীর শেষের কথা কয়টি শুনিয়াই তাহার

সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আমি পালাইনি স্যার, হাজির আছি; আমি আপনার সর্ব্বনাশের হেতু হয়েছি, এখন ভাবছি—কেন জল চেয়েছিলুন!"

রজনী যেন হারানিধি খুঁজিয়া পাইল; শ্রদ্ধাভরে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল,—"আপনাকে না পেলে কিন্তু আমার ক্ষোভের অন্ত থাকত না; আজ পয়লা বোশেখ, আপনি তৃষ্ণায় জল চেয়েছেন, এখনও আপনার তৃষ্ণা দূর করতে পারিনি, আপনি আসুন স্যার—"

ভদ্রলোক মর্ম্মস্পর্শী সুরে বলিলেন,—"তৃষ্ণা আমার মাথায় উঠে গেছে সাহেবের ব্যাভার আপনার মহত্ব দেখে, আর আমার জল খাবার স্পৃহা নেই—"

রজনী প্রগাঢ় মিনতির সুরে বলিল,—"আপনি জল স্পর্শ না করলে আমি আজ তৃপ্তি পাব না স্যার, আসুন।"

আফিসের হাতার বাহিরেই রাস্তার ধারে ছিল পান-লেমনেডের দোকান। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতকে যে ভাবে গৃহস্থ শ্রদ্ধাভরে সম্মান করে, তেমনই শ্রদ্ধাসহকারে রজনী সেই ভদ্রলোকটিকে দোকানে বসাইয়া বরফ-মিশ্রিত ডাবের জল পান করাইয়া তবে নিষ্কৃতি দিল, নিজেও মনে পাইল পরম পরিতৃপ্তি।

জনতাও সঙ্গে সঙ্গে দোকানের দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত মাড়োয়ী ভদ্রলোকটি রজনীর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। সে সমস্তই দেখিল। অবসর পাইয়া এইবার বলিল,—"বাবু সাহেব, নোকরী তো আপলোক ছোড়িয়ে দিলেন?"

রজনী হাসিয়া উত্তর দিল,—"ছাড়াবার ওপরওয়ালা শেঠজী, তিনিই এক কথায় ঢুকিয়েছিলেন এখানে, আজ আবার এক লহমায় ছাড়িয়ে নিয়ে চললেন এখান থেকে।"

শেঠজী গম্ভীরভাবে বলিল,—"ঠিক বাত বাবুজী! লেকেন, হামি লোকের এক ভারী বাত আছে আপনকার সাথে, কুছ্ কাম ত ফিন্ কোরতে হোবেক—।"

রজনীর মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, বলিল,—"তা হবে বই কি শেঠজী, নইলে খাব কি?"

শেঠজী তাহার স্থূল গদ্দানটি বার দুই আন্দোলিত করিয়া বলিল,—"খানাদেনেওয়ালা ভি ওপরওয়ালা বাবুজী! দুনিয়ামে কামের কোন্ পরোয়া আছে বাবুজী, পরোয়া বিলকুল আদমীর।"

বিস্ময়ের সুরে রজনী প্রশ্ন করিল,—"আদমীর! এত বড় কলকাতা সহরে কামের নেই ভাবনা, যত ভাবনা শুধু লোকের?"

মাথা নাড়িয়া শেঠজী পুনরায় কথাটার সমর্থন করিল, বলিল,—"সাঁচ্-বাত বাবুজী, সের ভোর জিলাপী লিয়ে সড়ক পড়ক পর ফেলিয়ে দেও, দেখিবে কেতো কুত্তা আসিয়ে ঝামেলা বাধাবে, লেকেন একঠো শের মিলবে না; আসমান দিয়ে হাজারো কাকু চীল্লাচীল্লি লাগায়ে দিবে, লেকেন এক ময়ূর আসবে না কভি! বাবুলোকের কমতি কুছ আছে? দোশো বাবু ত হিঁয়া কাম বাজাইছে, বৈঠে বৈঠে সবাই দেখল তামাসা! সাঁচ্-বাত হামিলোক কহিয়েছে বাবু সাহেব—কামকা পরোয়া কুছ নহি, বিলকুল পরোয়া সাঁচ্চা আদমীকা।"

রজনী নিরুত্তরে মুখ নত করিল। শেঠজী বক্রদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া সহসা রজনীর একখানি হাত ধরিয়া বলিল,—"শুনিয়ে বাবুজী, মেহেরবানি করিয়ে আপলোক হামার গদী পর চলেন, হামিলোক কাম বাতলায়ে দিবেক।"

শেঠজীর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রজনী বলিল,—"বেশ, চলুন।"

অদূরে শেঠজীর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। আহ্বান পাইয়া কোচোয়ান

গাড়ী লইয়া আসিল, সহিস দরজা খুলিয়া দিতে শেঠজী সাদরে রজনীকে অগ্রে ভিতরে বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিল।

তেজস্বী এক জোড়া ঘোড়া গাড়ী লইয়া রাজপথ কাঁপাইয়া ছুটিল।

*　　*　　*　　*　　*

কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলে রজনীর বাড়ী। মোটের উপর অবস্থা তাহার মন্দ নয়। বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে সহরবাস করিতে হয় না, বরং নিজবাড়ীর একাংশ ভাড়া দিয়া কিছু উপায় হয়। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার সুদও কিছু আসে, তাহার উপর আশী টাকা মাহিনার চাকুরী। সুতরাং রজনীর দিন স্বচ্ছলভাবেই কাটে। সংসারে সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী তিনটি ছেলে, দুইটি মেয়ে।

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী রজনীর প্রতিবেশী এবং মেকেঞ্জি মিলারের বিল ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু। মাসে যদিও তিনি পৌনে দুইশত টাকা বেতন পান, কিন্তু ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। রজনীর নিজের বাড়ী, তাহার সুন্দর চেহারা ও দৈহিক শক্তি এবং সাহেবদের সহিত সাহস করিয়া কথা কহিবার কায়দা, এই কয়টি ছিল বড়বাবুর চক্ষুশূল। আগেকার সাহেব রজনীকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন; ডিপার্টমেণ্টের প্রয়োজনে তিনি বড়বাবুকে এড়াইয়া রজনীকেই ডাকিতেন। বড়বাবুর ইহাতে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু নূতন সাহেব আসিয়া বড়বাবুকেই পছন্দ করিলেন; যেহেতু, বড়বাবু সাহেবের সকল ব্যবস্থাতেই নির্ব্বিচারে সায় দিলেন। রজনীর সহিত একদিন কথা কহিয়াই সাহেব তাহার উপর বিষম চটিয়া গেলেন। সাহেবের কথার উপর কথা কহে, প্রতিবাদ করে—এত বড় আস্পর্দ্ধা তাহার! বড়বাবু উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার শব্দভেদী বাণ একটি একটি করিয়া ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। আফিসে দশজনের মধ্যে যে সব কথা

হয়, সাহেব সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা চলে, বড়বাবু সেগুলি সাহেবের কানে তুলিয়া এই সূত্রে নিজে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন।

বড়বাবু ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বাসায় ফিরিয়াই আফিসের ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া পাড়াময় একটা চাঞ্চল্য তুলিলেন। তাঁহার মতে, রজনী অতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হইত। সাহেব মনিবের জাত, যদি অন্যায় একটা করিয়াই থাকেন, অতটা অধৈর্য্য হওয়া কি উচিত! এ বাজারে আশী টাকা মাইনের চাকরীটা এক কথায় গেল! ভাল কথা কানে না লইলেই এমন দুর্দ্দশা হয়।

সৌদামিনী দেবীর কানেও কথা গেল। স্বামী যে সাহেবের অন্যায় ব্যবস্থায় চটিয়াছিল, সে সংবাদ তাহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু রজনী যে সহসা সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া চাকরীটা ছাড়িয়া দিবে, একথা সে. কল্পনা করিতেও পারে নাই। মুখখানি ম্লান করিয়া সে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বৎসরের প্রথম দিন, এই দিনে কি কেহ সাধ করিয়া কোনও অশান্তি বাধায়!

রাত্রি যখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে, রজনী তখন বাড়ী ফিরিল। তখনও পর্য্যন্ত সৌদামিনী বিরস-বদনে গবাক্ষটির উপর বসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বামীর সহিত চোখোচোখি হইতেই সে চমৎকৃত হইল; সে দেখিল,—স্বামীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখখানির উপর বেদনার কোনও ছায়াও পড়ে নাই, বরং সে মুখের দীপ্তি আজ অপূর্ব্ব, কি একটা অপরিসীম উল্লাসের প্রভায় যেন জ্বল্ জ্বল করিতেছে!

রজনী হাসিয়া কহিল,—"আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ, না? চাকরী টুকু খুইয়ে কোথায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরব পাড়ার দশ জন পেছু পেছু ছুটে আসবে, সান্ত্বনা দেবে, তা নয়—এক গাল হাসি নিয়ে বাড়ী ঢুকলুম!"

সৌদামিনী যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"তা হলে যা শুনেছি সত্যি নয়, বল !"

রজনী সহাস্যে বলিল,—"আমার চাকরী যাবার কথা ? বিলকুল সত্য, বড়বাবুর বাড়ীতে হয়ত এতক্ষণে সত্যনারায়ণের সিন্নী চড়েছে ? তিনি পাড়ায় জয়ঢাক পিটে যে কথা রটিয়েছেন, তা হবে মিথ্যে ?"

—"তবে ?"

—"চাকরী অবশ্য খসেছে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে হল সেটা ব্যাঙাচীর ন্যাজ খস্‌বার মত ; এখন ডাঙায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।"

—"তোমার হয়েছে কি বল ত ? এমন ভাবে কথা বলছ, কার সাধ্য তা বোঝে।"

—"বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো। একটি গ্লাস জল নিয়ে বাধল ঝগড়া, সেই নিয়েই চাকরী গেল খসে।"

—"সে কথা পাড়ার সবাই শুনেছে।"

"—কিন্তু সে কাণ্ড যারা দেখেছে, তাঁদের ভেতরে ছিল আমারই মতন এক পাগল। আমাকে ত সে ধরে-পাকড়ে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। শেষে নাছোড়বান্দা হয়ে তার ঘানিতেই জুড়ে দিলে। রোমের একজন দিগ্বিজয়ী বীর দেশ জয় কর্‌তে গিয়েই বলেছিল—এলুম, দেখলুম, জয় করলুম ; আমারও অবস্থা আজ ঠিক সেই রকম—চাকরী খোয়ালুম লোকের বাহবা পেলুম, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডবল প্রমোশন্ !"

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সৌদামিনী বলিল,—"এদিকে বললে পাগল, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডবল প্রমোশন !—না বাপু, তুমি দেখছি আমাকেও পাগল না করে ছাড়ছ না। পাগলটা কে, তাই বল না শুনি ?"

রজনী এবার সহজ সুরেই তাহার আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের বিবরণ শুনাইয়া দিল। যে পাগল তাহাকে কাজ বাতলাইয়া দিবার জন্য ধরিয়া

লইয়া গিয়াছিল, তাহার নাম বাবু রামবদন শেঠ। ক্রস্ ষ্ট্রীটে তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত বিরাট কারবার। ভারতের বিভিন্ন মোকামে তাহার শাখা বিদ্যমান। তৃষ্ণাতুর এক অপরিচিতের প্রতি তাহার দরদ ও সেই সূত্রে জবরদস্ত সাহেবের সহিত বাদ-প্রতিবাদে তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা শেঠজীকে অভিভূত করিয়া ফেলে; ফলে, নববর্ষের এই প্রথম দিনটি হইতেই রজনী রায় রামবদন মাড়োয়ারীর বিপুল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতার ভার পাইয়াছে।

সৌদামিনী এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"মাইনে কত দেবে?··· "

বাঙ্গালীর সংসারে অধিকাংশ গৃহিণীর প্রশ্ন এইখানেই। রজনী গম্ভীর হইয়া বলিল,—"আমি ত চাকরী নিই নি, সাহেবের সৌজন্যে চাকরীর মোহ আজ কাটিয়েছি সদু। শেঠজীও আমার মনের গতি জেনে চাকরীর কথা তোলেননি? আমাকে তাঁর কারবারের সিকি অংশীদার করে' নিয়েছেন, লেখা-পড়া হয়ে গিয়েছে, কাল রেজেষ্টারী হবে। সাহেবের আফিসে আমি আশী টাকা মাইনে পেতুম, এখান থেকে মাসে একশো আশী টাকা খরচ বলে পাব, লাভের হিসেব হবে বছরের শেষে।"

পরদিন প্রত্যূষেই রজনীর নূতন ভাগ্যোদয়ের কথা পাড়ায় প্রচারিত হইয়া পড়িল। বড়বাবু স্বয়ং রজনীর বাড়ীতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"যা শুন্‌ছি, সত্যি নাকি হে?"

রজনী হাসিয়া বলিল—"কথায় বলে না—যা রটে তা বটে! আপনি কাল যা রটিয়েছেন, সেটাও যেমন সত্য, লোকে যা রটাচ্ছে, তাও মিথ্যে নয়; ফলে আমার অবস্থা হয়েছে ত্রিশঙ্কুর মত!"

কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বড়বাবু বলিলেন,—"তা কেন, বরং তুমি বলতে পার—তোমার হ'ল 'সাঁপে বর'! আফিসে তোমার কথা ছাড়া আর কথা

নেই, সবাই বলছে, হাঁ, তেজ দেখিয়ে গেল বটে! সাহেবটাও তার পর থেকে মুসড়ে গেল। হাজার হোক, রাজার জাত ত, হয়ত শেষে বুঝলে কাজটা ভাল হয় নি।"

রজনী বলিল,—"এখন থেকে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারবেন। সাহেবের যত কিছু রাগ আমার ওপরেই ছিল, আপনার ডিপার্টমেণ্ট এবার বেঁচে গেল, সাহেব ওদিকে আর ঘেঁষবেও না।"

বড়বাবু মুখখানি বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"তুমিও যেমন! বলে না—'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা'; প্রথম ঘা পড়েছে তোমার ওপরে, এর পরে একটির পর একটি আরও কতগুলি খসে' পড়ে দেখ না! শুন্তে ত পাবে সব।"

যথাসময়ে আফিসে গিয়া নিজের চেয়ারখানি টানিয়া বড়বাবু সবে মাত্র বসিয়াছেন, এমন সময় সাহেবের চাপরাসী আসিয়া তাঁহার আহ্বান জানাইল।

শশব্যস্তে বড়বাবু সাহেবের কামরার উদ্দেশে ছুটিলেন, ঘরে কম্পিতপদে প্রবেশ করিয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম বাজাইলেন।

সাহেব নিজের চেয়ারে গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন, মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত, পূর্ব্বদিনের সে নৃশংসতার কোন নিদর্শন মুখের কোনও অংশেই নাই।

বড়বাবুকে দেখিয়া সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—"রজনী রায়ের ঠিকানা তুমি জান?"

রজনীর বিবরণ সাহেবকে নিবেদন করিতে বড়বাবুর আগ্রহের অন্ত ছিল না। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে রজনীর ভাগ্যপরিবর্ত্তনের বিবরণটুকুও বড়বাবু যথাযথভাবেই সাহেবকে শুনাইয়া দিলেন।

সাহেবের মুখের গাম্ভীর্য্য আরও গভীর হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তাহার পর সহসা ব্যগ্রভাবেই বলিলেন,—"তুমি রামবদন মাড়োয়ারীর কুঠী জান ?"

বড়বাবু জানাইলেন,—"ক্রস্ ষ্ট্রীটে তার কুঠী, সবাই জানে।"

সাহেব বলিলেন,—"আফিস-কার' নিয়ে এখনই তুমি বেরিয়ে পড়, 'আমি ডেকেছি'—একথা জানিয়ে তুমি রজনীবাবুকে নিয়ে এস।"

নির্ব্বাক দৃষ্টিতে বড়বাবু সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাহেব এবার রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে আনা চাই, বড়বাবু,—যাও।"

বড়বাবু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"হয় ত আমার যাওয়াই বৃথা হবে স্যার। সাহেবের সঙ্গে অমন ব্যবহার কাল যে করেছে, সে কি আমার কথায় এখানে আসতে ভরসা করবে স্যার ?"

স্যার দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"নিশ্চয় আস্‌বে, সে লোক কাওয়ার্ড নয় ; দুনিয়ায় যারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে কিছুতেই ভয় পায় না, এ তাদেরই একজন !—যাও।"

ইহার উপর আর কথা নাই। সংশয়োদ্বেলিত বক্ষে বড়বাবু ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী সাহেবের আদেশ পালনে ছুটিলেন।

সাহেবের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই রজনী রায় বড়বাবুর সহিত সাহেবের খাস কামরায় প্রবেশ করিল, মুখে তাহার ভয়, উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কোন চিহ্নই নাই।

রজনীকে দেখিয়াই সাহেব শশব্যস্তে উঠিয়া শ্রদ্ধাভরে তাহার কর-মর্দ্দনে সম্বর্দ্ধনা করিলেন,—"গুডমর্ণিং বাবু !"

তাহার পর স্বহস্তে তাহাকে সম্মুখের আসনে বসাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,

"—আমি আগেই জেনেছিলুম, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে কুণ্ঠিত হবে না।"

রজনী কোনও ভূমিকা না করিয়া সহজ সুরেই বলিল,—"আমার প্রতি কি আদেশ স্যার!"

অতি কোমল কণ্ঠে সাহেব বলিলেন,—"কালকের আচরণে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি বাবু, আমার নিজের কার্য্যে আমি নিজেই লজ্জিত; সারারাত্রি আফিসের সেই অপ্রীতিকর স্মৃতি আমাকে পীড়া দিয়েছে, নিদ্রা আমাকে স্পর্শও করে নি!"

রজনীর প্রতি সাহেবের এই সশ্রদ্ধ আচরণ দেখিয়া বড়বাবু এক পার্শ্বে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাহার পর অনুতপ্ত সাহেবের মর্ম্মবাণী শুনিয়া তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। রজনীও বিস্ময়ে অভিভূত, সে এখানে আসিয়া সাহেবের এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিবে, তাহা কল্পনাও করে নাই; স্তব্ধ বিস্ময়ে সেও সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাহেবের কথা এখনও শেষ হয় নাই; পূর্ব্বের কথাগুলি বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেখ বাবু, যে নীতিতে আমি এই আফিস চালাব ভেবেছিলুম, কালকের ঘটনায় সে নীতি আমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমার সাহস ও তোমার প্রতি পাবলিকের সহানুভূতি আমি স্তব্ধ হয়ে দেখেছি, আর সেই সূত্রে আমি বুঝবার অবকাশটুকুও পেয়েছি যে, ভুল পথেই আমি আমার সঙ্কল্পের চাকা চালিয়েছিলুম। হাঁ, আমি তোমার কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে তৃপ্তি পাচ্ছি, কালকের কথা ভুলে যাও বাবু, আমাকে ক্ষমা কর।"

রজনী আবেগের সুরে বলিল,—"সাহেব আপনি মহৎ। ভুল

অনেকেই করে, কিন্তু তারপর সে-জন্য যে লোক অনুতপ্ত হয়ে তার সংশোধন করতে চায়, সে পায় তখন সকলের শ্রদ্ধা; বিশ্বের অনেক অমঙ্গলের মধ্য থেকে এই ভাবেই মঙ্গলময় ভগবান মঙ্গলের সূচনা করে দেন।"

সাহেবের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, বলিলেন,—"ধন্যবাদ বাবু, তুমিও এবিষয়টি উপলব্ধি করেছ। এখন আমার এই অনুরোধ বাবু, আমাদের সংস্রব ত্যাগ করতে পারবে না তুমি। আমি আগেই ক্ষমা চেয়েছি, আর আমার কালকের কথাও এখন প্রত্যাহার করছি, তুমি সম্মত হও বাবু।"

রজনী অবিচলিত স্বরে বলিল, "আপনার প্রতি আমার মনে কোনো অভিমানই আর নেই স্যার, আপনার এই মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি; কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত আমাকে প্রকাশ করতে হচ্ছে—আপনার এই সদয় অনুরোধ রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার আর নাই। আমি অন্যত্র কথা দিয়েছি স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সাহেব বলিলেন,—"আমি সে সব শুনেছি। কিন্তু তবুও আমার এই অনুরোধ বাবু! তুমি এই আফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুদিন থেকেই, সেই অধিকারে এ অনুরোধ আমি জানাচ্ছি। হাঁ, তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আমি স্থির করেছি শোন,—তুমি এই আফিসের সুপারভাইজার হয়ে আমাকে সাহায্য করবে, তোমার গ্রেড পাঁচশো, উপস্থিত আড়াইশো পাবে। তুমি রাজী হলেই আমি তোমাকে এই নূতন পদের নিয়োগ পত্র লিখে দিই।"

রজনী সুস্পষ্টস্বরে বলিল,—"কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি স্যার, সে আর ত ফেরাবার উপায় নেই। আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

সাহেব নিরুত্তরে কয়েক মুহূর্ত্ত রজনীর দৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ব্যথার সুরে বলিলেন,—"এর ওপর কোনো যুক্তি

নেই বাবু, আমি তোমার এ দৃঢ়তার প্রশংসা করছি ; কিন্তু মনে মনে বুঝছি—নিজের বুঝবার ভুলে তোমাকে হারিয়ে আমি এই আফিসের কত বড় ক্ষতি করেছি ! তোমার স্মৃতি আমি কোনো দিন মন থেকে মুছতে পারবো না, বাবু !"

সাহেবের এই মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলির উত্তরে গাঢ় স্বরে রজনী বলিল,—"সাহেব, জীবনে আমি কোনো দিন এমন অভিভূত হইনি, আজ আমি অসীম শ্রদ্ধায় আপনাকে অভিবাদন করে জানাচ্ছি—নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার মাশুলও শোধ করতে সক্ষম হয়েছেন, এ সৌভাগ্য সবার হয় না।

